দক্ষিণাপথের যাত্রী

শ্রীনিধিরাজ হালদার

সাহিত্য-সংসদ
কালীঘাট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীবিজয়চাঁদ হালদার
৪৩সি, মহিম হালদার ষ্ট্রীট,
কালীঘাট, কলিকাতা।

মহালয়া, ১৩৪৫
দাম—এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য
দি নিউ প্রেস
১নং রমেশ মিত্র রোড,
ভবানীপুর, কালিকাতা।

—ভূমিকা—

অনেকদিন পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের কয়েকটী স্থান ঘুরে যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছি সেই টুকুই পাঠক-পাঠিকার সামনে ধরে দিলুম। বই আকারে প্রকাশ পাবার আগে লেখাটী ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্ত্তমানে রচনার কিঞ্চিৎ অদল বদল হয়েছে। এক্ষণে পাঠক-পাঠিকাগণ সাদরে গ্রহণ করিলে আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

পুস্তিকাখানি প্রকাশ করতে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকেই বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ্রন্থকার

প্রকাশক—শ্রীবিজয়চাঁদ হালদার
৫৩সি, মহিম হালদার ষ্ট্রীট,
কালীঘাট. কলিকাতা।

মহালয়া, ১৩৪৫
দাম—এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য
দি নিউ প্রেস
১নং রমেশ মিত্র রোড,
ভবানীপুর, কালিকাতা।

—ভূমিকা—

অনেকদিন পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের কয়েকটী স্থান ঘুরে যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছি সেই টুকুই পাঠক-পাঠিকার সামনে ধরে দিলুম। বই আকারে প্রকাশ পাবার আগে লেখাটী ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্ত্তমানে রচনার কিঞ্চিৎ অদল বদল হয়েছে। এক্ষণে পাঠক-পাঠিকাগণ সাদরে গ্রহণ করিলে আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

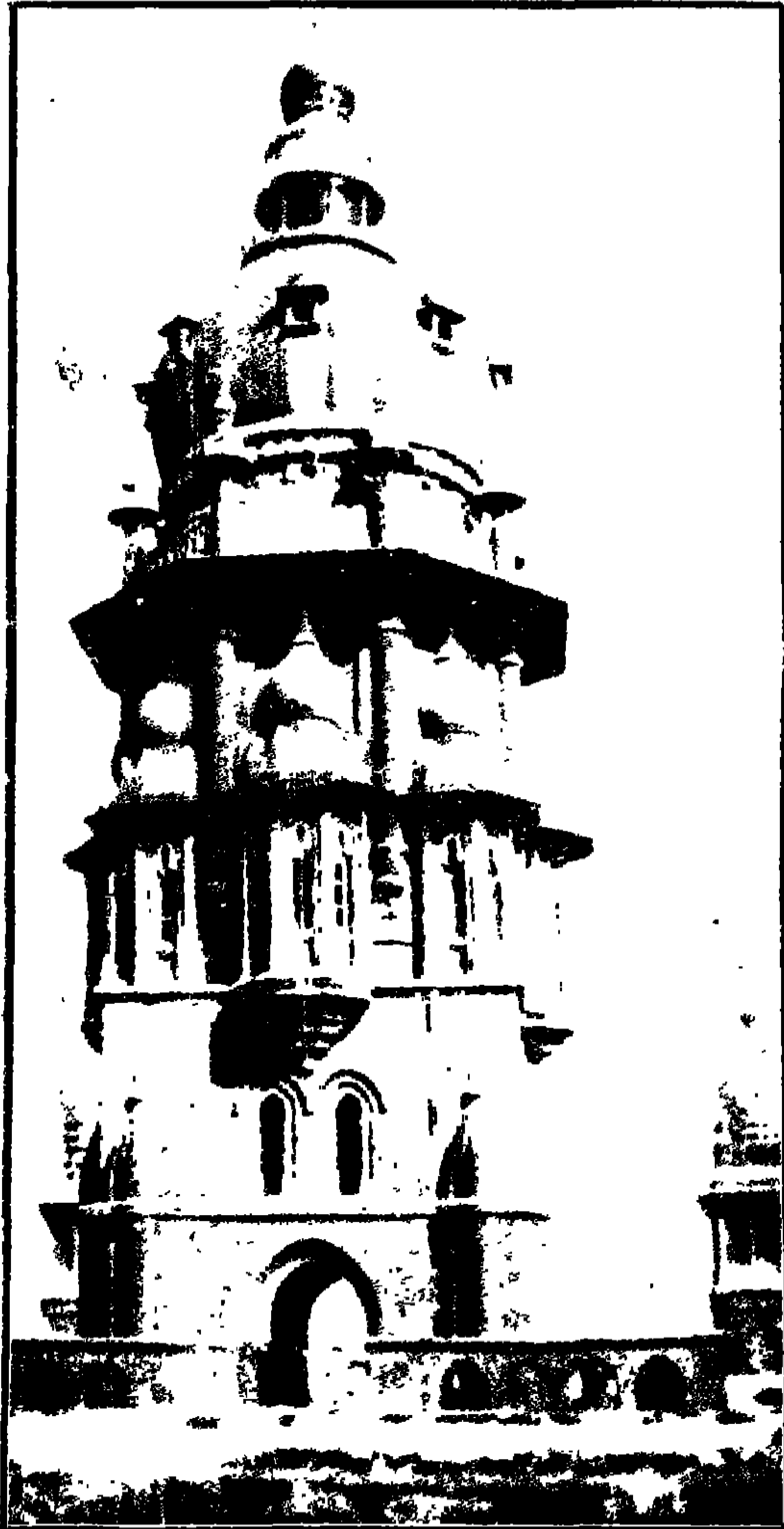
পুস্তিকাখানি প্রকাশ করতে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকেই বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ্রন্থকার

পূজ্যপাদ

স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

অর্পণ করিলাম।



আলোক স্তম্ভ (মাদ্রাজ)

দক্ষিণাপথের যাত্রী

ধর্ম্মের বালাই আমার কোনও দিনই ছিল না। তা ছাড়া আমি তীর্থ যাত্রীও নই। সুতরাং দিন ক্ষনের ব্যবস্থা না করেই জানুয়ারীর শেষাশেষি হঠাৎ একদিন মান্দ্রাজ মেলে চড়ে বসলুম। সহযাত্রী হ'লেন এক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী ও কয়েকজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক। বাংলা মুলুকের লোক বলতে একা আমি। রাত্রে আর কোন কথাবার্ত্তা বিশেষ কারুই সঙ্গে হয় নি, তবে তারা যে তাদের জন্মভূমি মাদ্রাজে চলেছেন এটা সামান্য একটু আলাপেই বেশ বোঝা গিয়েছিল। রাত দশটার মধ্যেই যে যার বিছানা, কম্বল বিছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি একা জেগে জেগে চিন্তা করতে লাগ্‌লুম কি ভাবে এবারের এই ভ্রমণটাকে বেশ আনন্দময় করে তোলা যায়। ঠিক করে ফেল্‌লুম পরদিন মধ্যাহ্নে গাড়ী ওয়ালটিয়ার এলে সেইখানেই সমুদ্রের ধারে দু'একদিন উদ্বেলিত তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত প্রাণ ভরে উপভোগ করব। আমার চোখে ঘুম ছিল না, কোনও রকমে চোখ দুটো বুজে কয়েক ঘণ্টা পড়ে রইলুম মাত্র। গাড়ীর কিন্তু কর্ম্মের বিরাম নেই, হুহু শব্দে ছুটে চলে যাচ্ছে। কতক্ষণ আর চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে থাকা যায়, আস্তে আস্তে বিছানার ওপর

দক্ষিণাপথের যাত্রী

উঠে বসে এ্যটাচি কেস থেকে মোপাসার একখানা গল্পগ্রন্থ বার করে, পড়তে স্বরু করে দিলুম। গল্প পড়তে পড়তে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলুম যে কখন ভোর হয়েছে তা' আমার খেয়াল ছিল না। বেলা তখন আটটা ক'মিনিট আর ঘণ্টা কয়েক বাদে ওয়ালটিয়ার পৌঁছব।

মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি ওয়ালটিয়ারে নামবেন ?"

হঁ্যা, না ক'রে উত্তর দিলুম—"না, একেবারে মাদ্রাজ—সেখানে আমার মেসোমশাই আছেন।

পরে সহযাত্রীটির সঙ্গে গল্প স্বরু হল। জন্মের দিন থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিয়ে ভদ্রলোটির সঙ্গে অনেক জটিল প্রশ্নের তর্ক উঠল। জীবনের রহস্য ভেদ করে মানুষের স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু কোথায় যে এর শেষ তা' আলোচনা করতে করতে গাড়ী ওয়ালটিয়ার এসে থামল। তখন বেলা প্রায় একটা ক'মিনিট। মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি তাঁর ঠিকানা দিয়ে ঐখানেই নেমে গেলেন।

ওয়ালটিয়ারে গাড়ী আধ ঘণ্টা থামবে স্বতরাং প্ল্যাটফর্ম্মে নেমে, ষ্টেশনের কলে বেশ করে মাথাটা ধুয়ে উদর পূজার সামগ্রী সংগ্রহের আশায় ট্রেণের একমুড়ো থেকে আর একমুড়ো পর্য্যন্ত পায়চারী করে, এমনি বরাত যে কড়ায়ের ডাল,

দক্ষিণাপথের যাত্রী

পেঁয়াজের বড়া আর কোকো ছাড়া খাবার মত কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল' না। ক্ষুধা যেন দুনিয়া পর্য্যন্ত গ্রাস করতে চাইছিল। এই পোড়া পেটের জন্যইত এত গোল। এমন সময় কলা ও কমলালেবু নিয়ে একজন উপস্থিত হল।

এক পয়সার জিনিষ চার পয়সায় কিনে মনে মনে ফিরিওয়ালার চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করে গাড়ীতে উঠে বসলুন। গাড়ী ছাড়ার তখন আর মিনিট দুই দেরী।

যাত্রা পথের পথিক আমরা, আমাদের যাত্রা আবার স্বুরু হল। গাড়ী আপন মনে চলতে লাগল, যেন তার কর্ত্তব্যের বিরাম নেই। গাড়ীর ভেতর বসে বসে মনে হতে লাগল যেন গাড়ীর সঙ্গে আমরাও উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি। আর পিছনে পড়ে থাকছে কত ঝোপ ঝাপ, নালা ডোবা, চাষাদের মেটে ছোট ছোট ঘর বাড়ী, গাছপালা, মাঠ আর মাঠ। যতদূর দৃষ্টি যায় চেয়ে দেখলুম মনে হল যেন কোন দিগন্তের পানে ছুটে চলছি। গোদাবরী ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামল। প্ল্যাটফর্ম্মে নেমে দেখতে পেলুম সাম্‌নে প্রকাণ্ড এক নদী। স্থানে স্থানে তার বালুর চর। সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম এই-ই সেই গোদাবরী নদী। গোদাবরী দৈর্ঘ্যে প্রায় ন'শ মাইল। ইহা ধলেশ্বর থেকে গৌতমী ও বশিষ্ঠা নামে দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছে। আবার ঐ দুই শাখার মধ্যে গৌতমী থেকে তুল্যা, আত্রেয়ী ও ভরদ্বাজী আর বশিষ্ঠা থেকে বৃদ্ধা গৌতমী

ও কৌশিকী প্রবাহিত হয়েছে। এই সপ্তস্রোতের সম্মিলন স্থান সপ্তগোদাবরী নামে খ্যাত এবং দাক্ষিণাত্যের পরম পুণ্যতীর্থ ব'লে প্রসিদ্ধ।

নদীর কথা বাদ দিয়ে এখন গ্রামের কথাই বলা যাক। গ্রামখানিরও নাম গোদাবরী। সম্ভবতঃ নদী থেকেই গ্রামের নামকরণ হয়েছে। মাদ্রাজ প্রদেশের এটা একটা জেলা। আগে এটা অন্ধ্র সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এখন ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই জেলাতেই মসলিপাটম্ ও কোকোনদা অবস্থিত। অনেকেই হয়ত জানেন যে এই মসলিপাটম নস্যর জন্য বিখ্যাত। কোকোনদা একটি বন্দর। যতদূর জানা যায়, এই কোকোনদার সন্নিকটস্থ সমুদ্রে শ্রীমন্ত সওদাগর "কমলেকামিনী" দর্শন করেছিলেন।

গোদাবরী গ্রামের মোটামোটি হিসাব নিকাস জেনে নিয়ে চুপ করে বসে রইলুম কারণ গ্রামে না ঢুকে রেলগাড়ীর কামরায় বসে বসে কত আর জানা যায়।

হঠাৎ গাড়ীর বাঁশী বেজে উঠল, গাড়ী আবার চলতে সুরু করে দিলে। আমরা গোদাবরী নদীর ওপর এসে উপস্থিত হলুম। লোহার পুল নীচে বিস্তীর্ণ বালীর চর। মাঝে মাঝে জল যে নেই তা নয়, যেটুকু জল আছে তারই ওপর দিয়ে ভেলার মত দু'চারখানা নৌকা পাল তুলে চলেছে। দূরে ঘাটে কেউ স্নান করছে কেউ বা সানের ওপর কাপড় কাচছে। বহু গ্রাম্য

দক্ষিণাপথের যাত্রী

মেয়ে মাটির কলসী গোদাবরীর জলে ভর্ত্তি করে কাঁকে তুলে পানীয় জল ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে ক্ষুদ্র গ্রাম মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমরা অলস পথিক রূপ-মুগ্ধের মত রূপই দেখে চলেছি। মনে করি এই বুঝি আমাদের কর্ত্তব্য, এই কাজ। হঠাৎ চেয়ে দেখি আর গোদবরী নেই কেবল দু'ধারে বিস্তীর্ণ মাঠ যেন দানবের মত হাঁ করে চেয়ে আছে। সেদিন ছিল পূর্ণিমার চাঁদ্‌নি রাত। চাঁদের রূপালী আলোর সঙ্গে রাতের কালো রং মিশে যেন আমাদের দু'পাশের সীমাহীন ফাঁকা স্থানগুলোকে জীবন্ত করে তুলছিল। রাত তখন বেশী নয় বোধ হয় দশটা কি এগারটা হবে। হঠাৎ দেখি আবার পুল। সহযাত্রীর নিকট জানলুম কৃষ্ণা নদী। নাম তার সার্থক হয়েছে, জল তার ঘন কালো। নীচে কালো জল, ওপরে তারার মালায় সাজানো নীল আকাশ। মনে হ'তে লাগল শুভ্র চন্দ্রমার রূপালী কিরণের সঙ্গে নক্ষত্রগুলো কৃষ্ণার কালো জলকে আলিঙ্গন করছে। সে মনোহর দৃশ্য লেখনী দিয়ে বর্ণনা করা চলে না। ইচ্ছে হো'ল নদীর তীরে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে সে দৃশ্য উপভোগ করি। আমার কানে কৃষ্ণার কুলুধ্বনি বীণার ঝঙ্কারের মত বাজতে লাগল। গাড়ীতে মাদ্রাজী ভদ্রলোকটির সঙ্গে একরাত্রের আলাপে মনে হো'ল যেন তিনি আমার কত আপনার হয়ে উঠেছেন। কথায় কথায় ভদ্রলোকটি তাঁদের দেশের কলার চাষের গল্প সুরু

করে দিলেন। তারপর হঠাৎ কিছু না বলেই একটা চুবড়ী থেকে একটা সুপক্ক কলা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—'যদিও ষ্টেশনে কেনা তা হলেও আপনি খান', এক রকম জোর করেই কলাটি আমায় খাইয়ে ছাড়লেন। কলাটি এত মিষ্টিও এত উপাদেয়, মনে হল যে সে কলার কাছে আমাদের দেশের ক্ষীর, রাবড়ীও হার মেনে যায়। রাত ক্রমেই ঘনিয়ে আসতে লাগল কাজেই কথাবার্ত্তার মাঝে আমরা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম।

রাত্রে আর গাড়ীতে বিশেষ ঘুম হ'ল না। কোন রকমে একটু গড়িয়ে ঘুমের নেশাটাকে কাটিয়ে দেওয়া হল মাত্র। যখন উঠে বসলুম, তখন প্রায় ভোর হয় হয় হয়েছে। মাদ্রাজী ভদ্রলোকটিও আমার সঙ্গে উঠে বসলেন। তিনি আমার কাছে কোলকাতার কত কথাই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কথায় কথায় জানতে পারলুম কয়েক বছর আগে তিনি কোলকাতায় খিদিরপুরে একটা বাসা বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন, আর কোনও একটা সওদাগরী অফিসে সামান্য কেরাণীর কাজ করতেন। কোনও রকমে কায়ক্লেশে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ হোত। বহু দুঃখের ইতিহাস বসে বসে শুনতে লাগলুম। শেষে একটু হেসে বললুম—"আমরাই ত আমাদের জীবনটাকে এম্‌নি দুর্ব্বিষহ করে তুলেছি, আর অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে চুপ করে চাকুরীর আশায় বসে আছি। স্বচ্ছন্দে চাষ বাস করতে পারি তা করব না। ঐ যে বাঁধা ধরা

দশটা আর পাঁচটা, ওটা যেন আমাদের মজ্জাগত হয়ে দাড়িয়েছে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বললুম—"আচ্ছা সাত সমুদ্দর তের নদীর কথা নাহয় বাদই দিলুম, কিন্তু কোথার সুদূর বিকানির, মাড়োয়াড় থেকে শুধু লোটা কম্বল সম্বল করে এমন ত দেশ নেই যেখানে তারা বড় বড় ইমারত্ হাঁকিয়ে দোরের সাম্‌নে ভোজপুরী দরওয়ান খাড়া করে না রেখেছে। সে কি মশাই, কেরাণীগিরি করে?"

ভদ্রলোকটি বল্‌লেন—সবইত বুঝি কিন্তু পেরে উঠি কই?"

বললুম—"কোথা থেকে পারবো? জেগে ত নেই ঘুমিয়ে আছি। উপায় আর কেমন করে হবে, চোখ চেয়ে যদি অন্ধ হয়ে থাকি কে আর পথ দেখাবে বলুন? চাক্‌রী করে করে আমরা জড়, স্থবির হয়ে গেছি। জাতের এই পাষাণ স্তূপকে সরাতে হলে আমাদের মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়াতে হবে, বুঝলেন?"

ভদ্রলোকটি হঁ্যা না কিছুই বলতে পারলেন না। কাছেই একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামতে তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে যাবার জন্যে অনেক অনুনয় বিনয় জানিয়ে ভোর রাত্রে নেমে গেলেন।

হাত ঘড়িটায় একবার চোক বুলিয়ে ভাবলুম তাইত আমারও ত নামবার আর বেশী দেরী নেই। বিছানা-পত্র বেঁধে গাড়ীর বেঞ্চে বসে ভাবতে লাগলুম কোলকাতার লোক আমি কি জানি মাদ্রাজ সহর কেমন লাগবে। মাদ্রাজিদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তেমন ধারণাও

নেই। তবে এইটুকু চিন্তা করে আশ্বস্ত হয়েছিলুম যে সেই সময় আমার মেসোমশাই ব্যবসার খাতিরে কিছু দিন আগেই মাদ্রাজে এসে বাস করছিলেন। কাজেই অসুবিধা ভোগ করবার ভয় ততটা ছিল না। গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে পেলুম আকাশের গায়ে তখনও দু'চারটে তারা মিটিমিটি জ্বলছে। আর দূরে তালবনের ফাঁকে ফাঁকে যেন একটু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কাক পাখীরাও উড়তে সুরু করেছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ পূব দিকটা রাঙ্গিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে যেন কিসেব একটা জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। চেয়ে দেখি মাদ্রাজ ষ্টেশনে এসে পৌচেছি। তখন ভোর সাড়ে ছ'টা। কিন্তু কলকাতার সময়ের তুলনায় মনে হল যেন বাহিরের সকাল কিছু বেলায় হয়। ষ্টেশনে আমার প্রতীক্ষায় মেসোমশাই তাঁর একটি বন্ধুর সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন। দু'রাত ট্রেণ যাপনের পর কোলাহলপূর্ণ মাদ্রাজ সহরে উপস্থিত হয়ে ক্ষণিকের জন্য মনটা একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠল। ষ্টেশন থেকে বা'র হয়ে দেখি সম্মুখে ট্রাম, ট্যাক্সি, ফিটন। ষ্টেশন থেকে আমাদের বাসা প্রায় দু'তিন মাইলের পথ, নাম ট্রিপ্লিকেন। বাসায় পৌছতেই কানে একটা বিরাট গর্জ্জন এসে পৌছ'ল। জিজ্ঞাসা করে জানলুম বাসা থেকে সমুদ্র ছ'সাত মিনিটের পথ সুতরাং বুঝতে আর বাকী রইল না যে সমুদ্রের গর্জ্জন, কারণ

দক্ষিণাপথের যাত্রী

পুরীধামেও ওরূপ গর্জ্জন শুনে শুনে এক রকম আগে থেকেই অভ্যস্ত হয়েছিলুম। যা'হোক বিশ্রামান্তে বাসার একজনকে সঙ্গে নিয়ে ট্রিপ্লিকেন ছাড়িয়ে আমরা আইস হাউস রোডে এসে পড়লুম। রাস্তার নাম আইস হাউস দেখে জিজ্ঞাসা করলুম 'এ আবার কি নাম ?' আমার সঙ্গী বললেন—"আর একটু গেলেই প্রকাণ্ড একটা সাদা বাড়ী দেখতে পাবে ঐ বাড়ীটার নাম হচ্ছে আইস হাউস। আগে যখন ভারতবর্ষে বরফের কল ছিল না তখন বিলেত থেকে জাহাজে করে ঐ বাড়ীতে বরফ এসে জমা হ'ত বলে ঐ বাড়ীর নাম হয়েছে 'আইস হাউস'। আর সেইথেকেই রাস্তার নামও আইস হাউস রোড। যখন বাড়ীটার কাছে এসে পৌছলুম তখন সাম্‌নেই দেখি বিস্তৃত সমুদ্রের ফেনিল জলরাশি বারবার এসে বালুময় বেলাভূমির চরণ তলে আছড়ে পড়ছে। বরফের বাড়ীর কথা ভুলে সমুদ্রের তীরে এসে উপস্থিত হলুম। তবে এইখানেই বলে রাখি বাড়ীটা সাধারণ বাড়ীর চেয়ে কিছু বড় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

এখানে রাস্তার কিছু বর্ণনার দরকার। রাস্তার একধারে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার জন্যে লম্বা সরু রাস্তা, আর তারই পাশ দিয়ে চলে গেছে মানুষ চলার পথ সেই পথের ধারে দু'চারটে ফুল গাছের বাগান। বাগানের নীচে বিস্তীর্ণ বালুকাময় বেলাভূমি, তারপর বিশাল সমুদ্র। যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন এখানকার দৃশ্য কি রকম। সন্ধ্যা আসন্ন প্রায়। সূর্য্যদেব

ডুবতে সুরু করেছেন। একদিকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বালুময় বেলাভূমির পাদদেশে আছড়ে আছড়ে পড়ছে, আর একদিকে সমুদ্রের নীল জলের সঙ্গে নীল আকাশ মিশেছে। সেইখানে অস্তগামী রবি ডুবু ডুবু যেন সমুদ্রের বুক চিরে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঠিক্‌রে পড়ছে, আর তারই মধ্যে একটা গোলাকার আগুনের থালা লুকোচুরি খেলতে খেলতে লুকিয়ে পড়ছে। এমন প্রাণ মাতান দৃশ্য দেখতে কার না ইচ্ছা করে? সে দৃশ্যের মাধুরী এম্‌নি যে আপনাকে আপনি ভুলিয়ে দেয়। বালির ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল যেন প্রকৃতি হাসতে হাসতে ধরায় নেমে এসে তাকে আলিঙ্গন করছে। দেখতে দেখতে দূরে লাইট হাউসের আলো জ্বলে উঠল। মনে মনে ভাবলুম পৃথিবীতে সবই সুন্দর। ফুলের গন্ধে যেমন ভ্রমর আপনা-হারা হয়ে ফুলের মধু খুঁজে বেড়ায় আমিও তেমনি প্রকৃতির রূপকে নিংড়ে বার করে নেবার জন্যে আপন-হারা হয়ে সমুদ্রের কূলে খানিক ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। রাস্তার দু'ধারে সারি বন্দী বিজলীর আলো জ্বলে উঠেছে। আমার সঙ্গে যিনি গিয়েছিলেন তাঁর নাম হরিদাস বসু আমি তাঁকে বললুম, "বোসমশাই এত ঘুম পাচ্ছে যে এখানে ঘুমোলেই ভাল হয়, এখান থেকে আর যেতে ইচ্ছে করছে না।"

বোসমশাই হাসতে হাসতে বললেন—"প্রথম দিনেই যদি এখানকার সমস্ত রসটুকু নিংড়ে খেয়ে ফেলতে চাও তা'হলে কাল কি

করবে ? আচ্ছা চল বাড়ী ফেরা যাক্, সকাল সকাল পেটটা ঠাণ্ডা করে আজকের রাতটা ভাল করে ঘুমিয়ে নাও, কাল আবার যত পার ঘুরে ফিরে বেড়িও।

অগত্যা বাসাবাড়ীর পথে ফিরলুম। আমাদের পশ্চাতে পড়ে রইল বালুচরের ওপর মরা শুক্তি, শামুক, নুলিয়ার জাল, তাদের মাছ ধরা নৌকো, বালি আর বালি। রাস্তায় আসতে আসতে ঠিক করলুম কাল-ই আমরা এ্যাকোয়েরিয়াম দেখতে যাব। শুনেছি তা'তে নাকি সমুদ্রের অনেক রকম মাছ আছে—দেখবার জিনিষও বটে। রাত্রে খানিক গল্প গুজব করবার পর নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে সেদিনকার মত আশ্রয় নেওয়া গেল।

পরের দিন একটু দেরীতেই ঘুম ভাঙ্গল। বোসমশাইয়ের দেখি সব কাজই সারা হয়ে গেছে। বল্লুম বা আমাকে ডাকলেন না কেন ?

উত্তরে তিনি বল্লেন, "দু'রাত্রি গাড়ীতে তোমার ঘুম হয় নি বলেই ডাকি নি।"

বোসমশাইকে বল্লুম, আপনাকে পেয়ে আমার ভারি সুবিধে হয়েছে, কারণ এখানে সঙ্গীর নিতান্ত প্রয়োজন—তবে আমার থাকার মেয়াদ ত জানেন ?

"তুমি কি আজকেই ফিরে যেতে চাও নাকি ?"

বল্লুম "না বোসমশাই, আমি যাবো সেতুবন্ধ রামেশ্বরে।"

"ও! তীর্থ করতে ?"

হাসতে হাসতে বল্লুম,—"তীর্থ নয়—আমি বেরিয়েছি দেশ পর্য্যটনের বহুদিনের একটা সাধ পূর্ণ করবার জন্যে। যখন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছি তখন এমন কিছু নিয়ে ফেরা চাই যা মানুষের চোখে একটা আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।"

বোস মশাই বল্লেন, "ও সব কথা এখন থাক, বেলা হয়েছে তাড়াতাড়ি কাজ কর্ম্ম সেরে নাও। সত্যিই বেলা হয়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি করেও সেদিন সকালে আর বাহির হওয়া গেল না। বিকেলে বোস মশাইয়ের সঙ্গে যখন সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালুম, তখন তার উত্তাল ফেনিল জলরাশি দেখে মনে হ'ল'—

'আমি পৃথিবীর শিশু ব'সে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব ; ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম্ম তা'র—বোবার ইঙ্গিত ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে।—'

ঢেউয়ের পর ঢেউ ফুলে ফুলে পৃথিবীর বুকে আছাড় খেয়ে পড়ছিল। ভাবলুম, আমি সহরে ঘুরবো কেন? কোথায় এমন কি বস্তু আছে যা আমাকে এ দৃশ্যের চেয়ে আর'ও বেশী আনন্দ দান করতে পারে?

বোসমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "কিহে, তুমি যে একেবারে বোবার মত চুপ করে রইলে?"

বল্লুম, "আমার আর অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। রাস্তায় বেরিয়ে মানুষ, গাড়ী, ঘোড়া ছাড়া আর ত কিছু দেখতে পাবো না ; কিন্তু এই মহাসিন্ধুর বেলাভূমির উপর দাঁড়িয়ে আমার যে আর কিছুই ভাল লাগে না বোসমশাই ?"

বোসমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "বৈরাগ্য নাকি ?"

বল্লুম, "আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, সংসারে আপনার আকর্ষণের বস্তুর হয় ত অভাবও নেই, কিন্তু সত্যি করে বলুন ত সময়ে সময়ে আপনার কি মনে হয় না যে আপনি কত অভাবের মধ্যে ডুবে রয়েছেন, কিন্তু তবুও এই সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে তার রূপ ছাড়া নিশ্চয় আর কিছু হয় ত ভাববার সময় পান নি, ভগবানের সৃষ্টি এমনি সুন্দর।"

একথা তুমি ঠিক বলেছ, সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে সব কিছুই ভুলে যেতে হয়।"

ক্রমেই দিনের আলো নিভে এল, বোসমশাই বল্লেন, 'চল এইবার বাড়ী ফেরা যাক।'

ফেরার পথে সমুদ্রের পানে বারবার চেয়ে দেখি আর ভাবি,—

'হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব-ভাষা ?—'

যদিও তুমি সর্ব্বগ্রাসী, তবুও তোমায় দেখলে চক্ষুর পাতা ফিরতে চায় না, মনে হয় তুমি যেন কত আপনার।

দক্ষিণাপথের যাত্রী

বাসায় ফিরে বোস মশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছি, আমার মেসোমশায় এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, মাদ্রাজ সহর তোমার কেমন লাগছে ?"

বল্লুম,—"অত্যন্ত খারাপ।"

"কেন ?"

"কারণ আমার মন এখানে মোটেই টিকেতে চাচ্ছে না। মানুষের মন যেখানে বসে না, সে দেশকে আমি কেমন করে ভাল বলব বলুন ?"

"তাহলে এখানে এত লোক কেমন করে বাস করছে ?"

আমি বল্লুম, "মানুষের কারো যদি হঠাৎ একটা পা কাটা যায়, তখন বাধ্য হয়ে তাকে অন্যের সাহায্য নিয়ে এক পায়েই পথ চলতে হয় সুতরাং যেটা যার মজ্জাগত, যেখানে মানুষ জন্মেছে সুখ সুবিধার অধিকারী হয়ে তার ত সেখানে ভাল লাগবেই।"

"যাক, খাওয়া-দাওয়ার কোনও কষ্ট হচ্ছে না ত ?"

খানিকটা হেসে উত্তর দিলুম, "ভয়ানক।"

আমার মাথাটা একটু নাড়া দিয়ে মেসোমশাই কাজে বেরিয়ে গেলেন। আমি বোসমশাইকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, আমাদের ত মাদ্রাজী খাবার-টাবার কিছুই খাওয়া হোল না ?"

"বেশ, আর তার কি, কালই হবে, এখানকার উৎকৃষ্ট খাওয়া হচ্ছে রসম, তারপর তিলের তেল, পেঁয়াজ, লঙ্কা, ওল, তেঁতুল, এ সব ত আছেই।"

"তারপর।"

"তারপর নারকেলের তাড়ি যথেষ্টই পাওয়া যায়। সন্ধ্যার আগে একদিন আশে-পাশে রাস্তার ধারে একটু লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝতে পারবে ছোট বড় কেউ আর বাদ নেই, যত সব ছোটলোকের দল একসঙ্গে বসে বসে ঐ তাড়ি খাচ্ছে। কি জানি, হয় ত ওটাই ওদের দিনের শেষে আনন্দ-উৎসব।"

"ঐ কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো মনে করছিলুম। সত্যি, কি ব্যাপার বলুন ত, অধিকাংশ নারকেল গাছের মাথাই ত কাটা আর এক একটা ভাঁড় ঝোলান, তবে কি এদেশে নারকেল পাওয়া যায় না?"

"পাওয়া যায়, তবে দাম বেশী। বুঝতেই ত পারছ, তাড়ি হলে ত আর নারকেল হবে না।"

হঠাৎ সেদিন রাত্রে দেখি আমাদের বহু-পরিচিত বিনোদদা বাসায় হাজির। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে, তুই কবে এলি?"

বল্লুম, "রামেশ্বর, মাদুরা প্রভৃতি ঘুরবো বলে বেরিয়েছি।"

বিনোদদা বল্লেন, "আমিও ত যাবো; তবে কাল পরশুর মধ্যেই কিন্তু যেতে হবে।"

নিতান্ত এই নীরস দেশে আর একজন সঙ্গীলাভ করে অত্যন্ত আনন্দিত হলুম। বিনোদদা মঠের একজন ব্রহ্মচারী তাছাড়া

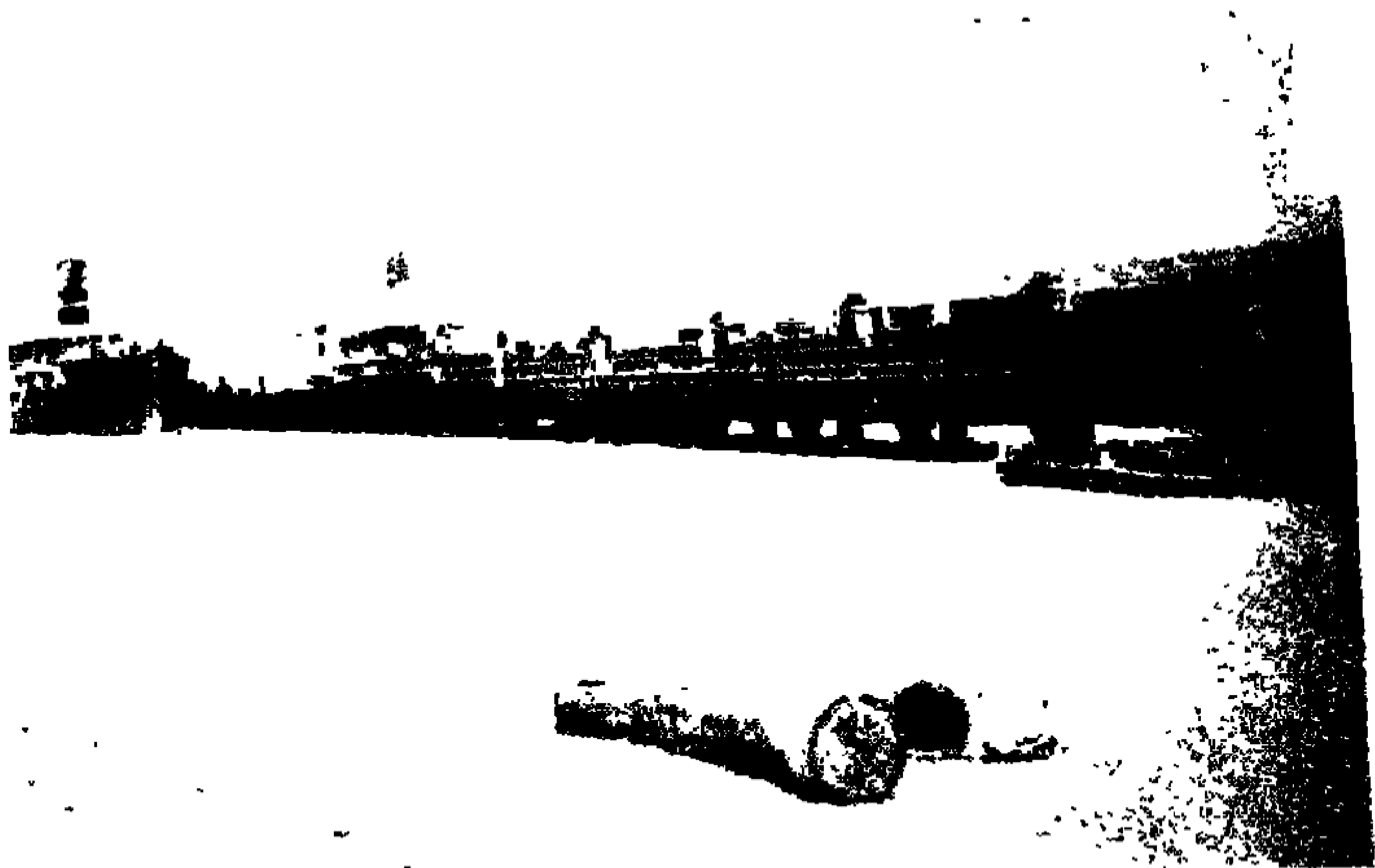
তিনি অনেক দেশ ঘুরেছেন। তিনি আমার মেসোমশাইয়ের ছেলেবেলাকার বন্ধু, তাই তিনি মধ্যে মধ্যে না এসে পারেন না। তাঁর মত সঙ্গী পেলে আমার যে কোনও কিছুরই অভাব হবে না তা আমি জানতুম, সুতরাং তাঁকে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলুম।

পরদিন মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব। বিনোদদার সঙ্গে আমরা সকলেই মঠে হাজির হলুম। প্রসাদ পাওয়ার জন্য অনেকেই দেখি খুব ব্যস্ত। প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও ছিল প্রচুর। আমরা কিছুক্ষণ নামকীর্ত্তন শোনবার পর বিনোদদা ও আর একটি মাদ্রাজী সাধু এসে বললেন,—"এইবার কিন্তু তোমাদের প্রসাদ পেতে হবে।"

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। অবেলায় ভাত ডাল খাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না তবু বাঙ্গালীর ছেলে প্রসাদে অভক্তি কোন দিনই নেই, সুতরাং পাতা বিছিয়ে প্রসাদ পেতে, আমরা বসে গেলুম। আশার বহু অতিরিক্ত পোলাও, নানা রকম তরকারী, মিষ্টান্ন খাওয়া হলেও একটা জিনিসের আস্বাদ মোটেই ভুলতে পারছিলুম না, সেটা মাদ্রাজীদের উপাদেয় রসম,—অন্য কিছুই নয়, তেঁতুল আর লঙ্কা গোলা দিয়ে কলায়ের ডালের পাতলা ঝোল। সাধারণ বাঙ্গালীর যা অরুচির খাওয়া তা এদেশের লোকের উপাদেয় খাদ্য। কারুরই দোষ দেওয়া চলে না, কারণ বিভিন্ন দেশের লোকের বিভিন্ন রুচি। সাধারণতঃ মাদ্রাজীরা আমাদের মত



রামেশ্বরের মন্দির



ধনুষ্কাঠী বন্দর

সরষের তেল খায় না, তিলের তেলে তাদের রান্না হয়, আমরা যা মোটেই খেতে অভ্যস্ত নই।

সন্ধ্যার পর আমরা বাড়ী ফিরে এলুম। প্রসাদ হলেও খাওয়া হয়ে গিয়েছিল অতিরিক্ত, সুতরাং সকাল সকাল মজলিস বন্ধ করে শুয়ে পড়া গেল। ঠিক হ'ল পরেরদিন সকালবেলায় বিনোদদা আর বোসমশাই এখানে দেখবার যা আছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সব দেখিয়ে দেবেন।

ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই কাণে এসে বাজতে লাগল, অদূরে সমুদ্রের উদ্বেলিত তরঙ্গাঘাতের আওয়াজ। ঝিঁ-ঝিঁর ডাক থেমে গেছে, জোনাকীর আলো নিভে গেছে, তারপর আস্তে আস্তে রাত্রির কালো অন্ধকারও সরে গেল। সবেমাত্র প্রভাতের আলো উঁকি মারতে সুরু করেছে। মনে হ'তে লাগল যেন প্রাণের ভেতর একটা নূতন জাগরণের সাড়া উঠেছে, দূর হ'তে যেন আমার কাণে মহাসাগরের গান ভেসে আসছিল এমন সময় হঠাৎ রাস্তায় "কু", "কু", একটা চীৎকার হতেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি একজন মাদ্রাজী স্ত্রীলোক প্রকাণ্ড একটা কালো হাঁড়ি মাথায় চাপিয়ে ঐ রকম বিকট চীৎকার করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলেছে। অবাক হয়ে বোসমশাইকে জিজ্ঞাসা করলুম, "এ আবার কি ব্যাপার, ঐ স্ত্রীলোকটা মাথায় কালো হাঁড়িটা নিয়ে চীৎকার করছে কেন?"

বোসমশাই হাসতে হাসতে বল্লেন, "খাবে, ডাকবো ?"

বল্‌লুম, "সে কি, ঐ রকম একটা কেঁলে হাঁড়ির ভেতর খাবার জিনিষ বিক্রী হচ্ছে ?"

"ওতে কি বিক্রী হচ্ছে জানো, টোকো, দই, এদেশে এমনি করে পাড়ায়-পাড়ায় দই ফিরি করে বেড়ায়।"

প্রথমটা যদিও ঐ রকম একটা বিকট আওয়াজের জন্যে মনে একটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তখনি অপরের ভাষায় আমি যে অজ্ঞ এ কথাটা ভেবে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ঐ রকম ভাবে দই বিক্রীর প্রথার উপর আমি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলুম না।

যাই হোক রীতিমত সকালবেলা চা, টোষ্ট খেয়ে আমি, বিনোদদা আর বোসমশাই এই তিনজনে বেরিয়ে পড়লুম সহরের দেখবার মত যা আছে তাই দেখতে। রাস্তায় পা বাড়াতেই দেখলুম প্রত্যেক বাড়ীর সামনের খানিকটা করে জলে ভেজান জায়গা আলপনা দিয়ে আঁকা। আর তারই ওপর যত রাজ্যের আবর্জ্জনার আঁস্তাকুড় হয়ে আছে। আমি বুঝে উঠতে পারলুম না এমন করে আলপনা দিয়ে ময়লা ফেলার তাৎপর্য্য কি, শেষে বোসমশাইকে জিজ্ঞাসা করে বুঝলুম, এ দেশের অধিকাংশ বাড়ীর দস্তুরই এই। মানুষের সংস্কার ও অভ্যাসের উপর কোনও কথাই বলা চলে না, সুতরাং বিশেষ আর কোনও কথা না বলে আমরা

পার্থ-সারথির মন্দিরে এসে ঢুকলুম। মন্দিরটি খুব বড় না হলেও নেহাত ছোট নয়। ওখানে বেশীর ভাগ মন্দিরেই নারকেলের ভোগ হয়। আমরাও ঝুনো নারকেল ভেঙে পুজো চড়ালুম। বোসমশাই বল্লেন, "দেখছি তোমার যে খুব ভক্তি হে।"

বললুম, "বোসমশাই, যদিও আমি আজকালকারই ছেলে, কিন্তু তাই বলে আমি এখনও আমার সংস্কার হারাইনি, তাই মাটীর প্রতিমা দেখলে আজও আপনা থেকেই মাথা নত হয়ে আসে। আর এই মাটীর দেবতাই মানুষকে অমর করতে পারে এ কথাটা ত' আর মিথ্যে নয়?"

বোসমশাই বল্লেন, "বেশ, দেবতা দরশনের পর এইবার বাজারটা ঘুরে আসা যাক।" বাজারে ঢুকে দেখি সহরের বাজার অতি সাধারণ, কোনও জিনিষের বিশেষ কোন পারি-পাট্য নেই, পেঁয়াজ, লঙ্কা আর তেঁতুলের আমদানীটা আমার চোখে পড়ল বেশী। সমুদ্রের মাছও বিক্রী হচ্ছে, সব বালি মাখানো। শূদ্র আর অপরাপর ছোট জাতরাই মাছ খায়। এদেশের ব্রাহ্মণেরা নিরামিষ আহার করে থাকেন এবং যারা মাছ খায় তাদের তাঁরা ঘৃণা করেন। প্রকাণ্ড একটা ওল কিনে বোসমশাইকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি ত প্রায় দু'টি মাস এখানে কাটালেন; এখানকার আচার-বিচার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা বলতে পারেন?"

বোসমশাই বললেন—"দেখ ভাই, মাদ্রাজে আসা পর্য্যন্ত সমুদ্রের কাছে ট্রিপ্লিকেনেই বরাবর বাস করছি। তা'ছাড়া এ রাস্তাটা সহরে একটা খুব দরকারী রাস্তা বলেই মনে হয়। স্কুল, কলেজ, কোর্ট, সমুদ্র সব জায়গায় এই রাস্তার ওপর দিয়ে যাতায়াতের স্থবিধে। তার ওপর যতটা আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা'তে মনে হয় এ জাতটা, ভাড়ী পিটপিটে; ছোঁয়া নেপা নিয়ে এরা মরে আর বাঁচে। এদিকে দেখ এদের বেশীর ভাগ লোকই এত গরীব, তবুও এরা তাড়ি আর জুয়া না হলে একদণ্ডও বাঁচতে পারে না। অবশ্য ছোট জাতের মধ্যেই এর প্রচলনটা বেশী। আমাদের বাংলাদেশের মেয়েরা যেমন পরদার আড়ালে বাস করে, এ দেশ কিন্তু তেমন নয়, বেপরোয়া চলাফেরা। মোটের ওপর স্ত্রী-স্বাধীনতাটা এখানে খুব বেশী। এ দেশে পুরুষের অনুপাতে মেয়েরাই লেখাপড়ার দিকে বেশী মনোযোগী। এদের মেয়েরা কাছা দিয়ে কাপড় পরে, আর পুরুষরা ঠিক উলটো, কাছা কিম্বা কোঁচা কিছুরই বালাই তাদের নেই। মুসলমানেরা যেমন লুঙ্গি পরে এদের পুরুষরাও ঠিক তেম্‌নি করে একখানা কাপড় দুপাট করে লুঙ্গির মত পরে। এমন কি বড় বড় চাকুরে বাবুরাও পায়ে জুতো না দিয়ে, কাপড়ের ওপর নেকটাই এঁটে আফিস কাছারী করে থাকেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, সব চেয়ে এরা খেতে কি ভালবাসে বলুন ত?"

"আগেই ত বলেছি তেঁতুল, লঙ্কা, পেয়াজ তবে সবচেয়ে বেশী খায় কলায়ের ডাল কারণ ডালের রসম্‌টাই হচ্ছে এদের একটা উপাদেয় খাদ্য।"

হঠাৎ বিনোদদা বল্লেন, "ওহে, তোমার যদি আর কিছু দেখবার থাকে তাহলে আজই তা সেরে নাও। কারণ ঠিক করেছি আজই আমরা সন্ধ্যার গাড়ীতে রামেশ্বর রওনা হব, পথে অবশ্য মাতুরায় নামবো।"

বল্‌লুম, "তবে চলুন, এ্যাকোয়েরীয়ামটা আজকেই দেখে নেওয়া যাক।"

তিনজনেই আমরা এ্যাকোয়েরীয়াম দেখতে গেলুম। সেটা একটা সমুদ্রের নানাবিধ মাছের চিড়িয়াখানা। কত রঙ বেরঙের ছোট বড় লম্বা সরু মাছ যে তাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তা বলা যায় না। সত্যই সেটা দেখবার জিনিষ।

ফেরবার পথে একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হোল। এতদিন ধ'রে কোনও বাঙ্গালীই আমার চোখে পড়েনি। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জানলুম, বিশ পঁচিশ জন বাঙ্গালী এখানে বাস করেন. কিন্তু এমনি বিড়ম্বনা কেউ কারোর খোঁজ-খবর রাখেন না। এই প্রথম আমার ধারণা হল বাংলাদেশের বাইরে সামান্য ক-ঘর বাঙ্গালীর মধ্যেও দলাদলি। যাই হোক, তাঁকে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে আমরা বাসায় ফিরে এলুম। তখন বেলা হবে

প্রায় বারটা। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে দুটি খেয়ে নেওয়া গেল। তারপর একটু বিশ্রাম করে জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নেবার ব্যবস্থা আরম্ভ হল, কারণ আগে থেকেই ঠিক করে ফেলেছিলুম আজই মাদ্রাজ সহর ছেড়ে মাদুরা, রামেশ্বর যাব'। তারপর যদি বরাতে জোটে কলম্বো পর্য্যন্ত পাড়ি দেওয়া যাবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা হয়নি। তার কারণ পাসপোর্ট ও অন্যান্য নানা খুচরো ইতিহাস।

আর কালবিলম্ব না করে বিকেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে সাতটা ক'মিনিটে বোটমেলে (এ দেশের লোকেরা চল্‌তি কথায় এই ট্রেনখানাকে বোটমেল বলে, কারণ এই ট্রেনখানা মাদুরা হয়ে সটাং ধনুস্কোটি পর্য্যন্ত গিয়ে কলম্বো যাত্রীদের ষ্টীমার ধরিয়ে দেয়)রামেশ্বরের পথে রওনা হয়ে গেলুম। বোসমশাই আমাদের দুজনকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে বাসায় ফিরে গেলেন। আমাদের সহযাত্রী হলেন একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জানলুম তিনি কলেজের ছাত্র। আমি কল্‌কাতার লোক, এই হিসেবে তিনি আমাকে কংগ্রেস সংক্রান্ত অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, তিনি ত্রিচিনাপল্লীতে নাম্‌বেন। গাড়ীতে ছিল খুব ভীড়, কাজে কাজেই কোনও রকমে ঠেলেঠুলে বসতে হ'ল। যতটুকু পারা যায় বসে বসে ঘুমিয়ে নেওয়া গেল। ভোর রাত্রে যুবকটি নেমে গেলেন। সে রাত্রে আমাদের যাত্রার

শেষ ছিলনা, কারণ রামেশ্বর যেতে হলে পরদিন বেলা একটার সময় মাদুরায় গাড়ী পৌছবে। তারপর বেলা চারটেয় ট্রেন বদলি করে রামেশ্বর। উপায় নেই, পাঁচশ' মাইল পথ আমাদের এমনি করে যেতেই হবে।

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের গাড়ীগুলো যেমন বিশ্রী, ষ্টেশনগুলোও তেমনি জঘন্য। খাবার জিনিষ ত মোটেই পাওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে এক এক জায়গায় গাড়ী থামছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে পাল, টি, কফি ও উপমাবড়া বিক্রেতার উচ্চ চীৎকারে কাণ যেন একেবারে বধির হয়ে আসছিল। পাল হচ্ছে জোলো দুধ, উপমা বড়া হচ্ছে কলায়ের ডাল আর পিঁয়াজ দিয়ে তিলের তেলে ভাজা একরকম বড়া। সুতরাং দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করতে আমাদের যা নাকাল হ'তে হ'য়েছিল তা আর বিশেষ করে না বলাই ভাল। যাই হোক, কোন প্রকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ীর মধ্যে কাটিয়ে পরদিন বেলা একটার সময় আমরা মাদুরায় পৌছুলুম।

নেমে কোথায় একটু শান্তি পাব তা নয়, পাণ্ডার ছড়িদার, অর্থাৎ দালাল এসে পেছু নিলে তারা বেশ বাংলা বলতে পারে।

কেবলি জিজ্ঞাসা করে, "কোথায় থাকবেন বাবু, কোথায় যাবেন, আপনাদের পাণ্ডা কে" এই রকম আরও কত কথা।

আর থাকতে না পেরে বললুম, "বাপু, আমরা তোমাদের দেশে ধর্ম্ম করতে আসিনি, আমাদের কোনও মানসিকও নেই, কেন

আমাদের বিরক্ত করছ?" কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। ছিনে জোঁকের মত তারা আমাদের পেছনে লেগে রইল।

অগত্যা বাধ্য হয়ে একজনকে বললুম "আচ্ছা তোমাদের কিছু দেওয়া যাবে, আমাদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিও।"

তাহাদের নির্দ্দেশ-মত এক ধর্ম্মশালায় ওঠা গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, কিছু জলযোগান্তে মাদুরা সহর দেখতে বেরিয়ে পড়া গেল। সঙ্গে ছিলেন বিনোদা আর ছড়িদার। মাদ্রাজ সহরের তুলনায় মাদুরা বেশ ভালই লাগল। ইতিহাস-বর্ণিত দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের কারুকার্য্য দেখে সত্যিই প্রাণে একটা সাড়া পড়ে গেল।

আমার সঙ্গী বিনোদদাকে বললুম "দেখুন এই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে মাদুরার মন্দিরের চূড়াগুলো কি সুন্দর দেখাচ্ছে! কত পুরোনো মন্দির, কিন্তু আজও মনে হচ্ছে যেন কত নতুন। মন্দিরের গায়ের কারুকার্য্য এত চমৎকার যে তা না দেখলে বর্ণনা করা যায় না। এই মাদুরা জেলার ভাষা হচ্ছে তামিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এই সহর প্রায় আটশ' বছর আগে পাণ্ডাদের শেষ রাজা সুন্দর পাণ্ডা তৎকালীন জৈনদের উচ্ছেদসাধন করে নিজ অধিকারে আনেন; পরে ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণের দ্বারা মাদুরা অধিকৃত হয়; তারপর ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে মাদুরা পুনরায় হিন্দু রাজার অধীনে আসে এবং প্রায় তেত্রিশ বছর রাজত্ব করার পর হঠাৎ রাজার মৃত্যুতে

মাতুরা রাজ্য আবার খণ্ডীভূত হয়ে যায় এবং ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যটি চাঁদ সাহেবের অধীনে আসে। পুনরায় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটের নবাবের পক্ষ থেকে ইংরাজেরা এই রাজ্য শাসন করতে আরম্ভ করেন। পরে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে নবাব ইংরাজদের রাজ্যের স্বত্ব ছেড়ে দেন। এই হচ্ছে মাতুরার যৎসামান্য ইতিহাস। মাতুরা কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। মাদ্রাজি সাড়ী সবই মাতুরার প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ এগার হাতের বেশী লম্বা কাপড় পরেন না কিন্তু মাদ্রাজি মেয়েরা ১৩।১৪ হাতের কম লম্বা কাপড়ে কুলোতে পারেন না। কাজেই এদেশে ১৩।১৪ হাতের কম লম্বা কাপড় পাওয়াও যায় না। মাতুরা জেলার অন্তর্গত ডিণ্ডিগুল সহরে বহুপরিমাণে তামাকের চাষ হয়, আর সেই তামাক ত্রিচিনাপল্লিতে এসে চুরুট আকার ধারণ করে নানা দেশে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকে। শোনা যায় ১৬০০ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাতুরা সহরে রোম্যান ক্যাথলিক যাজকরা প্রায় দশ লক্ষ লোককে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষা দেন।

যাই হোক এখন ইতিহাসের কথা ছেড়েদিয়ে মাতুরার উপস্থিত কিছু কিছু হিসেব-নিকেশ দেওয়া যাক। ভাগৈ নদীর কূলে মাতুরা সহর অবস্থিত। নগরস্থিত দেবালয় আয়তনে, অলঙ্কার-সম্পদে ও শিল্প-নৈপুণ্যে দক্ষিণ ভারতে অতুলনীয়। দেবালয়ের প্রধান মূর্ত্তি সুন্দর স্বামী বা সুন্দরেশ্বর। প্রধান নগরের

কাছেই মীণাক্ষী দেবীর মন্দির। দেবালয়ের পরিমাণ উত্তর দক্ষিণে আটশ' সাতচল্লিশ ফিট, আর পূর্ব্বে পশ্চিমে সাতশ' চুয়াল্লিশ ফিট। ন'টি সুউচ্চ ও নানা দেবমূর্ত্তি সমন্বিত গোপুরম্ এর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করে আছে। সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপ দেবালয়ের প্রধান দর্শনীয় বস্তু। মণ্ডপটি ন'শ' সাতানব্বই স্তম্ভযুক্ত। বিশ্বনাথ নায়কের সেনাপতি ও মন্ত্রী আর্য্য নায়ক এই সুবৃহৎ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের মন্দিরের মত সুন্দর কারুকার্য্যখচিত দেবালয় কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। মন্দিরের কাছেই একটা প্রকাণ্ড সমচতুষ্কোণ জলাশয় আছে। কথিত আছে যে, তৎকালীন তিরুমল নায়ক কর্ত্তৃক টেপ্প কুলম নামে এই বৃহৎ জলাশয়প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জলাশয়ের প্রত্যেক দিক দু'হাজার চারশ' হাত পরিমিত। জলাশয়ের মাঝখানে একটা দ্বীপ আছে; তার ওপর একটা উচ্চ মন্দির সংস্থাপিত। বছরে একদিন টেপ্পম (এক রকম নৌকা বিশেষ) সহযোগে দেবালয়ের মূর্ত্তিগুলি জলাশয়ের চারদিক ঘুরিয়ে আনা হয়, আর সেই উপলক্ষে জলাশয়ের চারি তীরে লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়। যদিও আমাদের ভাগ্যে এ দৃশ্য দেখা ঘটে ওঠেনি, তবু বছরের একদিন এই দৃশ্য সত্যিই উপভোগ্য। ছড়িদারের সঙ্গে ঘুরে মন্দিরের ও কাছাকাছি যা কিছু দেখবার ছিল সব দেখে নিলুম। সমস্ত দিন ট্রেনে জেগে শরীর ও মন এত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াবার ইচ্ছে হচ্ছিল না। কোন

রকমে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হলুম। দেখি এর মধ্যে আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সপরিবারে ধর্ম্মশালায় এসে জুটেছেন কথায় কথায় বুঝলুম তিনি কলকাতার কাছাকাছিই থাকেন। সঙ্গে আছেন তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও একমাত্র অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যা। ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা কইছি এমন সময় বৃদ্ধা এসে জিজ্ঞাস করলেন—"তোমরা বুঝি রামেশ্বর যাবে বাবা?"

উত্তর দিলুম "হ্যাঁ"।

"আজকেই বুঝি এসেছ?"

বললুম, আজকেই দুপুরে এসেছি, আজকেই যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ট্রেন না থাকায় কালকে যাব ঠিক করেছি।"

এই সময় মেয়েটি এসে ডাকলে—"ঠাকুমা, মা ডাকছে একবার এদিকে এস।"

মেয়েটিকে দেখে মনে হল যেন এর ভেতর মোটেই কোনও আড়ষ্ট ভাব নেই, আমাদের দেখে যে কোনও লজ্জা বা সঙ্কোচবোধ সে সব এর আছে বলে মনে হল না তার বাবার সঙ্গে কথা কইছি এমন সময় মেয়েটী এসে আমাদের কথাবার্ত্তা বেশ মন দিয়ে শুনতে লাগল। মাঝে মাঝে দু'এক কথায় যোগ দিতে লাগল। বেশ মনে আছে তার বাবা রামচন্দ্রের সেতুবন্ধ ও রামায়ণ সংক্রান্ত দু' একটি কথা আমাকে বলছিলেন, এমন সময় মেয়েটি বললে, "আজকালকার ছেলেরা জলে পাথর ভাসানোর কথা বল্লেইহেসে উড়িয়ে দেয় কেন বলুনত বাবা?"

ভদ্রলোকটির নাম ত্রিলোচন রায়। বয়সে বৃদ্ধ না হলেও যুবক নন।

বললুম, "রায় মশাই, আপনার কন্যাটির কি নাম রেখেছেন বলুন ত? বেশ চালাক দেখছি; পড়াশোনা করে ত?"

ত্রিলোচনবাবু বললেন, "এর নাম হচ্ছে সুধীরা, আমরা 'সুধা, সুধা' বলেই ডাকি। ওর ঠাকুমার বড় আদুরে। গেল বছর ম্যাটরিকুলেসন পাশ করে প্রাইভেটে আই, এ দেবার চেষ্টা করছে।" সমস্ত শোনার পর ত্রিলোচন বাবুর সঙ্গে বেশ একটু ঘনিষ্ট পরিচয় হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হল' কাল আমরা এক সঙ্গেই রামেশ্বর রওনা হব।

অনেকক্ষণ বসে বসে ছড়িদার বললে—"বাবু, তাহ'লে আপনারা খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করুন, আমি কাল সকালে এসে আপনাদের মন্দির দর্শন করিয়ে নিয়ে আসব।"

ছড়িদার, চলে গেলে ত্রিলোচন বাবু বললেন--"আপনার সঙ্গীটির বোধ হয় এতক্ষণ অর্দ্ধেক রাত।"

পিছন ফিরে দেখি বিনোদদা বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

তাঁকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি, আজ আর খাওয়া-দাওয়া কিছু করবেন না?"

"এখন আর কোথায় কি পাব যে, খাওয়া-দাওয়া করব? কাল সকালে যা হয় চেষ্টা করে দু'টো ডালে চালে ফুটিয়ে নিলেই হবে।

তোমার যদি খুব বেশী ক্ষিদে পেয়ে থাকে একটু দুধ কিনে এনে খেতে পার ?" বলে বিনোদদা ফিরে শুলেন।

কে আর দুধ কিনতে যায়, এই ভেবে আমিও কম্বল ও চাদরটা নিয়ে শোবার উপক্রম করছি, এমন সময় ত্রিলোচন বাবুর কন্যা সুধা একটা এ্যালুমিনিয়ামের রেকাবে কিছু ফল ও সন্দেশ নিয়ে এসে বললে—"ঠাকুমা এই সামান্য ফল ও মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়ে বল্লেন, "রাত-উপোসী থাকতে নেই।"

সুধা এসে কথা ক'টা এমন ভাবে বলে গেল যে তার মানে হয় এখুনি সব না খেয়ে নিলে আর রক্ষে নেই।

বললুম—"ঐখানে রাখ, ডিসটা কাল দিলে চলবে ত ?"

বিছানার একধারে ডিসটা নামিয়ে রেখে সুধা তাড়াতাড়ি চাদরটা আমার হাত থেকে নিয়ে পাততে পাততে বলেলে—"ও এখানকার নয় ; কল্‌কাতা থেকে আনা ; তিলের তেলের বালাই নেই ওতে।"

বিনোদদাকে ডেকে তুলে দু'জনে ফল আর মিষ্টান্ন খেয়ে নিয়ে বললুম, "ভাগ্যিস তোমরা এসেছিলে।"

সুধা অমনি হেসে উত্তর দিলে—"আর আপনারা এসেছিলেন, তাই ত দিতে পেলুম।"

বললুম—"বেশ কাল তা হলে দু'টি ভাতও দিও।"

"সে ত আমাদের সৌভাগ্য, তাহলে আপনাদের কাল আর হাত পুড়িয়ে চাল ডাল ফোটাবার দরকার নেই বুঝলেন ?" বলে

সুধা ডিম আর গেলাশ নিয়ে চলে গেল। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম এই মেয়েটার এত মায়া আমাদের ওপর কেন?

নিদ্রাদেবী আমাদের উভয়কেই পেয়ে বসেছিল সুতরাং কি ভাবে যে ওটা ছোট্ট একটা স্বপ্নের ইতিহাস রেখে রাত ভোর হল আজ সেই কথাই বলব। জীবনের ইতিহাসে অনেক অঘটন ঘটেছে। বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর বুকে মানুষের কলরব যখন দিগন্ত মুখরিত, এমনি একদিন, সন্ধ্যা হয় হয়, পশ্চিম গগনে অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রেখাটা তখনও মিশিয়ে যায় নি। লোকালয়ের বাইরে বিস্তীর্ণ মরুভূমির এক প্রান্তে একাকী শুয়ে শুয়ে ভাবছি, দিনের আলো ত নিভে গেল, এখন কেমন করে অন্ধকারে অজানাপথে বাড়ী ফিরব। দেখতে দেখতে কোথা থেকে যেন এক অতি পরিচিত সঙ্গীতের মিষ্টি সুর আমার কানে এসে বাজল। আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মাঝে দৃষ্টি প্রসারিত করে রইলুম। প্রতীক্ষায় সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। নির্জ্জন বালুময় মরুভূমির প্রতি স্তরে স্তরে অন্ধকারের কালো রঙ অনতিদূরে ভাসমান সুরের সঙ্গে মিশে নির্জ্জনতাকে আরও গভীর করে তুলছিল। ভয় হল বুঝি-বা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কোন মৃত পথহারা পথিকের প্রেত-আত্মা আমাকে ছলনা করছে। কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। তার পর আকাশের গায়ে পুঞ্জীভূত তারার আলোয় বুঝতে পারলুম কোনও এক নারীমূর্ত্তি

সম্মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হল আমারই মত সে-ও বুঝি পথহারা, শ্রান্ত, আশ্রয় খুঁজছে। শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে ?' উত্তর এল, 'কে'। মনে হল আমার নিম্নস্বর অবগুণ্ঠিত নারীর কর্ণে পৌছয়নি। আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "কে তুমি এমনি করে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছ ?"

প্রতিধ্বনি হল' বটে কিন্তু উত্তর এল, "আপনার নতুন যায়গায় কোনও কষ্ট হচ্ছে না ত ?"

কষ্ট—কেন কিসের কষ্ট, বেশ আরাম করে রাত্রিতে শুই, দিনের বেলায় পথে পথে ঘুরে বেড়াই; কৈ আমার ত কোনও কষ্ট হয় না। হঠাৎ পেছন অট্টহাসির শব্দে চেয়ে দেখি রায় মহাশয়ের কন্যা সুধা খিল খিল করে হাসছে। ভোর হয়ে গিয়েছিল, ছড়িদারের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখি, ধর্ম্মশালার একটা ঘরে বিনোদ-দা তখনও ঘুমুচ্ছেন। বিনোদদাকে ডেকে বললুম,—'এইবার উঠুন, ভোর হয়েছে।' গত রাত্রের জলখাবার দেওয়া থেকে বিছানায় চাদর পাতা পর্য্যন্ত সব কথাই আবার নূতন করে মনে পড়তে লাগল। উপরন্তু স্বপ্নের কথা মনটাকে আর এক বোঝা চিন্তার খোরাক জুগিয়ে রেখে গেল।

হাত মুখ ধুয়ে বসে আছি, বিনোদ-দা জিজ্ঞাসা করলেন,—"কিহে ওঠ এইবার, সহরটা একটু ঘুরে দেখে আসা যাক।"

বললুম,—"চলুন না, রায় মশাইকেও সঙ্গে নেওয়া যাক। ওঁরাও ত রামেশ্বর যাবেন, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

বিনোদ-দা বললেন,—"মেয়েছেলে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি উনি কি আমাদের সঙ্গে গিয়ে উঠতে পারবেন।"

কি একটা বলতে যাচ্ছিলুম, ছড়িদার ঘুরে এসে বললে, "চলুন বাবু, মন্দির দর্শন করবেন, আজ যদি রামেশ্বর যেতে হয় তাহলে আর দেরী করবেন না, তাছাড়া ঘুরে ফিরে দেখতে বেলাও হয়ে যাবে অনেক।"

বললুম, "না-হয় একদিন দেরীই হবে, সকালবেলা এক কাপ চা না খেলে যে একপাও নড়তে ইচ্ছে করে না ছড়িদার।"

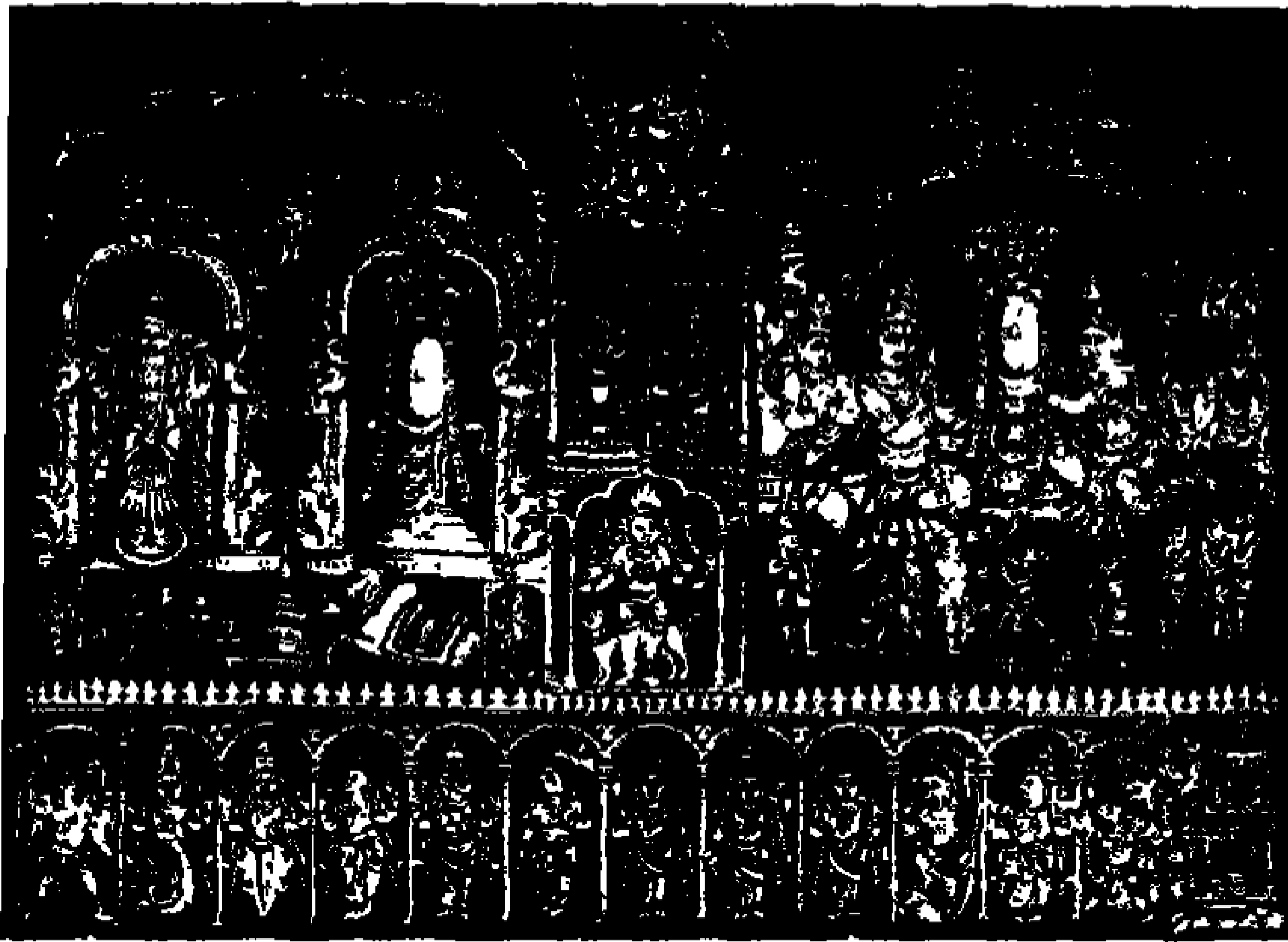
এমন সময় রায় মশাই এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল ত?"

বললুম, "রায় মশাই, নির্ভাবনায় আমরা ঘুমিয়েছি। জানি যে কদিন এ দেশে থাকা যাবে সে কদিন আমাদের বেশ সুখেই কাটবে।"

রায় মশাই হাসতে হাসতে বললেন, "কেন, এ দেশটা আপনাদের বুঝি ভারি ভাল লেগেছে?"

"দেশ যত ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, সবচেয়ে ভাল লেগেছে এই সুদূর দক্ষিণাপথে আপনাদের সঙ্গ লাভ।"

"সেটা আমার পরম সৌভাগ্য।"



রামেশ্বর মন্দিরে দেবমূর্ত্তি



রামেশ্বরের শিবমূর্ত্তি

সেই সময় সুধা দুটো এ্যানামেলের গ্লাসে চা এনে বললে, "কিন্তু এই গ্লাসেই আপনাদের খেতে হবে, কারণ বুঝতেই পারছেন।"

একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কেমন করে জানলে আমরা চা খাই, আমরা যে চা খাই না।"

সুধা অবাক হয়ে বললে, "আপনারা কলকাতার লোক, বাড়ীতে চা আর পান দিয়ে লোক-লৌকিকতা করেন আর আপনি বলছেন কি না, 'চা খাই না', এটা আমার কাছে ভারি আশ্চর্য্য বলে মনে হচ্ছে।"

হাসতে হাসতে উত্তর দিলুম, "আর যদি খাই তাহলে বোধ হয় আরও আশ্চর্য্য হবে, কেমন ?"

আর কোনও কথা না বলে একটা গেলাস বিনোদদাকে এগিয়ে দিয়ে বল্লুম, "যখন তুমি এত কষ্ট করে তৈয়ারী করে আনলে, তখন কি না খেয়ে পারি।"

সুধা বললে, "না না, আপনাদের যদি খাওয়া অভ্যাস না থাকে তবে খেয়ে আমাকে খুসী করতে গিয়ে অনর্থক শরীর খারাপ করে লাভ কি বলুন।"

চা খাওয়া শেষ করে বিনোদদা বললেন, "সুধীরা, তোমার কোনও চিন্তা নেই, চা না খেলে বরঞ্চ আমাদের শরীর খারাপ হবে, চা'র অপেক্ষায় আমরা ঘরে বসেছিলুম কারণ জানি তোমাদের সঙ্গে যখন কেট্‌লি এসেছে তখন অন্ততঃ এক ঢোকও আমরা ভাগ পা'ব।"

"আচ্ছা আমাকে যেমন ঠকালেন আমি কিন্তু এর প্রতিশোধ নোব।"

বললুম, "যদি তোমাদের সঙ্গে আমরা রামেশ্বর না যাই ?"

"আমাদের সঙ্গে না হয় নাই যাবেন, কিন্তু এতদূর এসে রামেশ্বর না গিয়ে নিশ্চয়ই থাকতে পারবেন না।"

রায়মশাই বললেন, "কি, আজ ত আমাদের যেতে হবে, তাহলে আরদেরী করে লাভ কি, চলুন বেরুনো যাক।"

আর বাক্যব্যয় না করে সকলে ছড়িদারের সঙ্গে আর একবার ভাল করে মাদুরা সহরের যা কিছু দেখা বাকী আছে তা দেখতে বেরিয়ে পড়লুম। মাদুরা সম্বন্ধে যা বলবার তাহা আগেই বলেছি। মন্দির দর্শন করে ফেরবার পথে রায়মশাই একটি কাপড়ের দোকানে সওদা করার জন্য ঢুকতেই বললুম, "আমি আর যাবোনা, যা নেবার কিনে আসুন, ততক্ষণ রাস্তায় একটু পায়চারি করি।"

রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, আপনার বুঝি কিছু কেনার বরাত নেই ?"

বিনোদদা বললেন, "সুবোধ, মাদুরায় এসেছিস, যাহোক একটা কিছু কিনে নিয়ে যা, তবুও একটা চিহ্ন থাকবে।"

হাসতে হাসতে বললুম, হ্যাঁ যাবার সময় এক টিন নস্যি নোব' আপনারও হবে আমারও হবে।"

রাস্তায় আমি আর বিনোদদা কথাবার্ত্তা বলছি, এমন সময় সুধা এসে তাড়াতাড়ি একখানা প্রকাণ্ড রঙচঙে শাড়ী আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "সুবোধদা, দেখুন ত কাপড়খানা কেমন, আপনার পছন্দ হয় ?"

হেসে উত্তর দিলুম, "সুধা, তোমার চেহারা যেমন সুন্দর, কাপড়খানাও তেমনি সুন্দর, পরলে তোমাকে চমৎকার মানাবে।"

"আমাকে ঠাট্টা করছেন বুঝি সুবোধদা ?"

সুধার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললুম, "যে সুন্দর তাকে সুন্দর বলতেও কি দোষ ?"

সুধা মুখটা একটু ভারি করে বললে, "আমাকে দেখতে সুন্দর কিনা তা ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিনি।"

"সুধা, তাকি কেউ কখনও জিজ্ঞাসা করে, যারা বুদ্ধিমান লোক তারা আপনিই তা বুঝতে পারে। কাপড়খানা যে তোমার নিজের জন্যে পছন্দ করতে চাও একথাটা ত আর মিথ্যে নয়, সুতরাং তোমার চেহারার অনুপাতে এটা যে মানানসই, আমি তোমাকে সেই কথাই বলছি এতে কেমন করে তুমি বুঝলে তোমাকে ঠাট্টা করছি ?"

সুধা আর কোনও কথা না বলে দোকানে ফিরে যেতেই রায়-মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, "সুবোধ বাবু কি বললেন ?"

"সুবোধদার কাপড়টা ভারি পছন্দ হয়েছে বাবা, আমি ত তোমাকে তখনি বলেছি কাপড়টা ভাল।"

কাপড়ের দাম চুকিয়ে দিয়ে সকলে ধর্ম্মশালায় ফিরে আসতেই রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের কটায় ট্রেন ?"

টাইম-টেবলখানা ভাল করে উল্টে পাল্টে বললুম, "এখন অনেক সময় আছে, "বেলা দেড়টার পরে। আমরা ঠিক সন্ধ্যের আগেই রামেশ্বর পৌছব।"

ব্রহ্মচারী বিনোদদা সাংসারের কোনও কথায় থাকতেন না, কিন্তু তিনি তবুও রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "রায়মশাই, কাল রাত্রি থেকেই সুধীরা আমাদের কিন্তু ভাতে-ভাতের নিমন্ত্রণ করে রেখেছে, তার কতদূর বলুন ত।"

রায়মশাই হাসতে হাসতে বললেন, "তীর্থদর্শনের পর ব্রাহ্মণ, সাধু ভোজন করান তীর্থ-দর্শনের আর একটা অঙ্গ সেটা যাতে অসম্পূর্ণ না থাকে মা আমার তাই দেখছি আগে থেকেই আপনাদের নিমন্ত্রণ করে রেখেছে। সত্যি কথা বলতে কি এমনি ভাবে পথের মাঝে আপনাদের পাব তা আমি কোন দিনও ভাবতে পারিনি। সঙ্গী অবশ্য অনেক পাওয়া যায় কিন্তু আপনাদের মত এত আপনার হয়ে জোটা, সেটাও পুণ্যফল।"

বললুম, "একা একাই সবটুকু পুণ্য আপনারা ভোগ করবেন, যদিও আমরা তীর্থযাত্রী নই, তবুও তীর্থ স্থানে মন্দির ত আমরা দর্শন করেছি কিন্তু এমনি বরাত, কোথায় আমরা ব্রাহ্মণ-ভোজন করাব, না ভোজন করেই যাচ্ছি।"

সুধা এসে বলে বসল, "ভোজন করবার প্রয়োজন আছে বলেই বাধ্য হয়ে করতে হয়।"

বললুম, "সুধা, এ জগতে মানুষের অনেক কিছুই প্রয়োজন আছে, সুতরাং তাদের অনেক কিছুই ভেবে কাজ করতে হয়।"

"বেশ আমি দাঁড়িয়ে রইলুম বেশ ভালকরে ভেবেই আমাকে বলুন।"

বিনোদদা বললেন, "সুধীরা, তোমার সুবোধদার কথা বাদ দাও, এখন কি বক্তব্য তাই বল শুনি।"

"বেশ ব্রহ্মচারী মশাই, আপনি তবে একাই আসুন সুবোধদাকে জগতের প্রয়োজন চিন্তা করতে দিন।"

হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলুম, "সুধা এরই মধ্যে আমাদের ভাতে-ভাত প্রস্তুত, তা বলতে হয়।"

সুধা জবাব দিল, 'সোজা কথায় আপনাকে জবাব দিলে ত চলবে না সুবোধদা, একটা কথা বল্লে বারোবার তার মানে না করলে আপনার কাছে নিস্তার পাওয়াই দায়।"

"বেশ, এখন থেকে যে কদিন তোমাদের সঙ্গে আমাদের ঘোরবার মেয়াদ আছে অন্ততঃ সে কদিন আমি মুখটি বুজে থাকব এখন চল তোমাদের তীর্থ-দর্শনের শেষ পুণ্যটুকু সঞ্চয় করিয়ে দিয়ে আসি।"

কম্বল বিছিয়ে ধর্ম্মশালার একটা ঘরে রায়মশাই, আমি ও

বিনোদদা খেতে বসেছি সম্মুখে রায়মশায়ের বৃদ্ধা মাতা বসে আছেন, সুধা কলাপাতা পেতে ভাত, ঘি, মুগের ডাল, আলু-ভাতে ও একটা নিরামিষ আলুর তরকারী দিয়ে গেল। সেগুলি খাওয়ার পর, বৃদ্ধা বললেন, "যাও মা এইবার দুধ, কলা আর চিনি এনে দাও বিদেশে ধর্ম্মশালায় খাবার কত কষ্ট হ'ল।"

বৃদ্ধা আপন মনে কথা কটা বলে যাবার পর বললুম, "আচ্ছা ঠাকুমা, আপনি কি বলতে চান আমরা বাড়ীতে রোজ মোণ্ডা মেঠাই খেয়ে থাকি? আজ যে রকম আপনার আশীর্ব্বাদে খাওয়া হ'ল এরকম যদি রোজ জোটে তাহলে আমি আপনার সঙ্গে সমস্ত তীর্থদর্শন করতে প্রস্তুত আছি।"

বিনোদদা বললেন, "এও কিন্তু আমাদের জোটেনা মা—ঠাকরুণ।"

"তা যাই হোক বাবা "তোমাদের তৃপ্তি হলেই হোল" বলে বৃদ্ধা উঠে গেলেন।

সুধা দুধের বাটী হাতে করে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি সুধা দাঁড়িয়ে আছ যে, আবার কি মুগের ডাল থেকে খাওয়াতে চাও নাকি?"

সুধা বললে, "আপনি যদি খেতে চান তা আবার খাওয়াতে পারি বৈকি।"

"না আধপেটাই ভাল শেষে তোমার ভাতে কম পড়লে মনে

মনে গালাগালি দেবে ত! দরকার নেই” এই বলে উঠে পড়তেই বিনোদদা বললেন, “তিলের তেলের চোটে এতদিন আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল, আজ তবু মুখটা বদলান’ গেল, রান্নাগুলি চমৎকার হয়েছে।”

সুধাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিনোদদাকে বললুম, “সুধার রান্না ভারি চমৎকার, সব চেয়ে আমার কিন্তু ভাল লেগেছে আলু-ভাতেটা।”

বিনোদদা হো হো করে হেঁসে উঠলেন, সুধা মুখ ভার করে চলে গেল।

আর ঘণ্টাখানেক বাদেই আমাদের মাদুরার মায়া কাটিয়ে রামেশ্বর রওনা হতে হবে। ছড়িদার আমাদের সঙ্গেই যাবে, পূর্ব্বেই তা ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

সামান্য বিছানা গুছিয়ে নিতে বসলুম। সুধার ঠাকুমা আমাদের মুখশুদ্ধি দিয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলুম, “আপনাদের সকলের খাওয়া হয়েছে ত ঠাকুমা ?”

বৃদ্ধা বললেন, “হ্যাঁ বাবা, আজকের মত একরকম চুকে গেল, দেড়টায় গাড়ী বুঝি ?”

বললুম, “প্রায় দেড়টা, বিছানাপত্র সব গুছিয়ে নিন, ছড়িদার এলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।”

বৃদ্ধা চলে যাবার সময় বললুম, “ঠাকুমা সুধাকে এক গ্লাস জল দিয়ে যেতে বলুন না।”

সুধা জল এনে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে চুপ করে দাড়িয়ে রইল। এক নিঃশ্বাসে এক গ্লাস জল পান করে বললুম, "সুধা আমার ওপর তুমি রাগ করেছ, না?"

সুধা তত্রাপি নীরব।

বিনোদদা বললেন, "না না, রাগ করবে কেন, যদি রাগই করবে তা হলে বলবামাত্রই জল এনে দিত না।"

জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে সুধা বললে, "সুবোধদা আপনি মনে করবেন না যে আমি রাঁধতে পারিনা, "আমি যা জানি আপনার কলকাতার অনেক বড় বড় উড়ে বামুনের চেয়ে তা ভাল। তা ছাড়া আলু-ভাতের কথা যদি বলেন, তাহলে ঐ রেষ্টুরেণ্টের চপ, ডিমসেদ্ধ আর মাংসেরকারীর চেয়ে আলুভাতে অনেক ভাল তা আমি একশোবার বলব। মনে করবেন না, যে আলুভাতে রান্না করা যায় না।"

"বেশ, সে কথা মুখে বলে ত লাভ নেই কাজে দেখিয়ে দিলেই হয়। লেখাপড়া শিখেছ, নতুন ধরণের কত রান্না তুমি ত জানবেই, রান্নার কত বড় বড় ইংরিজী বই তোমাদের পড়তে হয়েছে।"

সুধা উত্তর দিল, "আচ্ছা এই কিস্‌কিন্ধ্যার দেশে আমাকে যা খুসী বলে নিন, কলকাতায় ফিরে গিয়ে বই-পড়া রান্নারই কিছু পরিচয় আপনাকে দোব।"

এমন সময় ছড়িদার এসে বললে, 'চলুন, আপনারা সব গুছিয়ে নিয়েছেন ত?'

আমরা সকলে প্রস্তুত হয়েই ছিলুম বলবামাত্র বেরিয়ে পড়লুম। যাবার পথে পেছন থেকে মন্দিরগুলিকে আর একবার প্রণাম করে মাদুরা সহর থেকে বিদায় নিলুম।

রামেশ্বরগামী ট্রেণ যাত্রী নেবার জন্যে ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিল, আমরা একটা ছোট্ট কামরায় সকলে মিলে উঠে বসলুম। ছড়িদার বললে, "আপনাদের সকলকে রামেশ্বরে নাবিয়ে নোব, আর একবার গাড়ী বদল করতে হবে। আমি পেছনের গাড়ীতেই রইলুম। পথে যদি কেউ এসে অন্য কোনও পাণ্ডার কথা বলে, আপনারা গোবর্দ্ধন পাণ্ডার নাম করলে কেউ আর কিছু বলবে না।"

ছড়িদার চলে গেলে ট্রেণ ছেড়ে দিতেই বললুম, 'যত বেটা এসে জুটেছে কেবল পয়সা মারবার ফিকির।"

বৃদ্ধা বললেন, "না বাবা, এ ছড়িদার লোকটা ভাল।"

বললুম, "প্রথম প্রথম ওরকম সবাই ভাল থাকে তারপর তীর্থগুরুর প্রণামী নিয়েই গণ্ডগোল বাধে। তা যাই হোক শুনেছি রামেশ্বরের পাণ্ডারা নাকি ভাল লোক, বেশ যত্ন করে।"

সুধা জিজ্ঞাসা করলে, "সুবোধদা, এই ত সেই সেতুবন্ধ রামেশ্বর, এই সমুদ্রইত পাথর দিয়ে বেঁধে রামচন্দ্র রাবণকে বধ করে সীতা উদ্ধার করেছিলেন ?"

বললুম, "যদিও সে রাম নেই, লঙ্কাও নেই তবুও সেই ত্রেতায় একপাল বাঁদর মিলে সমুদ্রের জলে পাথর ভাসিয়ে কি যে এক অঘটন ঘটিয়েছিল তার কিছু কিছু নিদর্শন অন্ততঃ আমরা পাব। ভগবান রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে এই রামেশ্বর হিন্দুমাত্রেরই পরম পবিত্র তীর্থস্থান।"

গাড়ী মেঠো পথ ধরে ছুটে চলেছে, পেছনে পড়ে থাকছে কত অসংখ্য তাল, নারকেলের বাগান, মাঠ আর মাঠ। কত ছোট ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থামতে থামতে শেষে একটা ষ্টেশন এসে গাড়ী প্রায় আধঘন্টা থেমে রইল, ছড়িদার এসে বল্লে, "যাঁরা কলম্বো যাবেন ডাক্তার এখানে তাঁদের পরীক্ষা করবে। বুঝলুম কোয়ারেণ-টাইন একজামিনেসন। ছড়িদারকে জিজ্ঞাসা করলুম, "এর পরেই তাহলে আমাদের আবার গাড়ী বদলাতে হবে ত ?"

ছড়িদার বল্লে, "হ্যাঁ বাবু, ছোট লাইন, মাত্র আট ন মাইল পথ। রামেশ্বরে পৌছাবার আর বেশী দেরী নেই, আপনারা কলকাতার লোক এতদূরে একটু কষ্ট হবে কিন্তু মন্দির দর্শন করলে সত্যাই আনন্দ পাবেন।"

কোয়ারেণটাইন পরীক্ষা শেষ হবার পর গাড়ী ছেড়ে

পামবন ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হতেই আমরা সবাই তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম। সুধা জিজ্ঞাসা করলে, "এ গাড়ীটা কোথায় যাবে সুবোধদা?"

বললুম, "এটা এদেশের চলতি কথায় হচ্ছে বোট মেল, একটু পরেই ধনুষ্কোটি ষ্টেশনে গিয়ে থামলে যাঁরা কলম্বো যাবেন সমুদ্রের ধারেই তাঁরা ষ্টিমার পাবেন ওপারে যাবার জন্যে, যাকে চলতি কথায় এখন আমরা লঙ্কা বলে থাকি।"

আমরা গাড়ী বদল করে পামবন ব্রীজের ওপর এসে উপস্থিত হলুম। দেড় মাইল লম্বা ব্রীজ, সমুদ্রের উপর যে পুল সম্ভব হতে পারে, তা এই প্রথম দেখে যতখানি না আশ্চর্য্যান্বিত হ'লুম তার শতগুণ বেশী আনন্দিত হয়েছিলুম তার কারণ সমুদ্রের ওপর দিয়ে রেল গাড়ী ছুটে চলেছে, নীচে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই জলে ভেসে রয়েছে আর তারই ওপর সমুদ্রের জল আছড়ে আছড়ে পড়ছে। এই পাথরের ওপর রেল কোম্পানী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বীম বরগার সাহায্যে এমনি ভাবে পুল নির্ম্মাণ করেছেন যে ইচ্ছে করলে মাঝখান দিয়ে পুলটাকে ষ্টীমার যাবার জন্যে খোলাও যেতে পারে। সত্যই এখানকার দৃশ্য এতই সুন্দর যে যুগ-যুগান্তর ধরে বসে বসে দেখলেও যেন আশ মেটেনা। নীচে সমুদ্রের ওপর পাথরের আশে পাশে কতকটা যায়গা চড়া বলে মনে হ'ল, সেখানে জলের গভীরতা খুব অল্প, ঢেউয়ের জোর তেমন নেই।

কিন্তু একটা কথা এখনও আমার মনে হয় যে, এই বিশাল সমুদ্রের ধারে এত বড় বড় পাথর কেমন করে এসে হাজির হল। পাথরের চেহারা দেখে অবশ্য মনে হয় যেন তারা কত যুগ-যুগান্তর ধরে সমুদ্রের নোনা জলে মিশে ফোঁপরা হয়ে পড়ে রয়েছে, কত কালো কালো :শওলা তাদের ওপর এসে জমা হয়েছে। তাই আজও ভাবি পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়।

আমরা পুল পার হয়ে ডাঙায় এসে পড়তেই রেলের জানলা দিয়ে তুপাশে চেয়ে দেখি কেবলই বালি আর বালি, যেন আমরা মরুভূমির রাজ্যে এসে পৌচেছি। রেলের লাইনের ধারে পনর বিশ হাত অন্তর অন্তর কুলিরা লাইনের ওপর থেকে কেবলই বালি পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

রামেশ্বরটা একটা দ্বীপ, চারি পাশেই তার সমুদ্র ঘিরে রয়েছে, তাই তার চারিদিকে বালির আর অভাব নেই। চারি দিকে এত বালি হলেও পথের মাঝে মাঝে তাল নারকেলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগান দেখতে পাওয়া গেল। আমাদের রেল বালির ওপর দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে, মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বালির পাহাড় এমনি ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে, তাদের ফাঁক দিয়ে দূরে সীমাহীন সমুদ্র আমাদের নজরে পড়ছিল। তখনও চারিদিকে রৌদ্রের বেশ জোর ছিল, তাই দূর থেকে সমুদ্রের জলগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন গলান রূপো চারিদিকে টলমল করছে।

সন্ধ্যে হবার তখনও কিছু বাকী ছিল, আমরা রামেশ্বরম্ ষ্টেশনে এসে নামলুম। ছড়িদার বল্লে, "বাবু "এখান থেকে মন্দির খুব কাছে, আরও কাছে আপনাদের থাকবার নতুন ধর্ম্মশালা।"

বল্লুম, "বেশ, চল আগে ধর্ম্মশালায় গিয়ে ওঠা যাক।"

সুধা বল্লে, "এখানে গাড়ী পাওয়া যায় না ?"

ছড়িদার বল্লে, "না, এখানে গরুর গাড়ী ছাড়া অন্য কোন গাড়ী পাওয়া যায় না।"

সুধাকে বল্লুম, "তোমরা তাহলে গরুর গাড়ীতেই এস, সামান্য একটুখানি পথ আমি হেঁটেই চলে যাব।"

সুধা বল্লে, "তবে চলুন আমিও তাহলে আপনাদের সঙ্গে যাই।"

রায়মশাই তাঁর মার জন্যে একটী গোযান ঠিক করলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি গরুর গাড়ীতে চড়তে রাজী হলেন না। বৃদ্ধা বল্লেন, "তীর্থ করতে এসে গরুর গাড়ীতে আমি চড়তে পারব না।"

অগত্যা সমস্ত মালপত্র গরুর গাড়ীতে তুলে আমরা পদব্রজেই ধর্ম্মশালায় হাজির হলুম। ধর্ম্মশালা এমন সুন্দর স্থানে তৈরী হয়েছে যে, ঘরে বসে বসে সমুদ্রকে প্রাণভরে দেখা চলে। সামনেই বেশ পরিষ্কার রাস্তা, একেবারে মন্দির পর্য্যন্ত চলে গেছে। রাস্তায় জলের কলও দেখতে পেলুম আবার ধর্ম্মশালার ভেতরও

বেশ বাঁধান পাতকুয়া রয়েছে। কাছেই ছোট্ট বাজার। ছড়িদারকে জিজ্ঞাসা করলুম, "এখানকার লোকেও কি তিলের তেল খায়?"

ছড়িদার বল্লে, "না বাবু এখানে আপনি পশ্চিমা হিন্দুস্থানীর খাবারের দোকান পাবেন, সেখানে ঘিয়ের পুরি, তরকারী, রাবড়ী, পেঁড়া কিনতে পারেন। রান্না না করলেও আজকের রাত্রে আপনাদের খাওয়ার কোনও কষ্ট হবে না।"

ছড়িদারের সঙ্গে কথা কচ্ছি, এক পাল পাণ্ডা এসে খোঁজ-খবর নিতে লাগল, আমরা কোথা থেকে আসছি আগে এখানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কেউ এসেছিল কিনা, বড় বড় লম্বা লম্বা জাব্দা খাতা নিয়ে তারা হিসেব দেখার মত আমাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম ধাম খুঁজতে লাগল, কারণ যদি কারুর খাতায় আমাদের পূর্ব্বপুরুের নাম পায় তাহ'লে যার খাতায় তা পাওয়া যাবে তাকেই আমাদের পাণ্ডা বলে মেনে নিতে হবে, অন্ততঃ তাই নেওয়াই উচিত। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ছড়িদারের পাণ্ডাই ঠিক রয়ে গেল।

পাণ্ডার গোলমাল মেটবার পর ছড়িদারকে বল্লুম, "আচ্ছা তুমি তাহলে এবার এস, আমরা সন্ধ্যের পর মন্দিরে আরতিটা দেখে আসবো, তারপর কাল সব কিছু ঘুরে ফিরে সারা যাবে।" ছড়িদার চলে গেল।

সেদিন সত্যই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম তবুও আমি মুখ হাত ধুয়ে ছড়িদারের অপেক্ষা না কোরে ফাঁকা পথে বেরিয়ে পড়লুম। খানিকদূরে এসে পেছন ফিরে চেয়ে দেখি সুধা আমার পেছু নিয়েছে। বল্লুম, "কি তুমি যে এলে?"

সুধা হাসতে হাসতে বল্লে, "বা, আপনি ত বেশ মজার লোক, আমাকে একলাটি ফেলে চলে এলেন।"

বল্লুম, "তোমাকে একলা ফেলে এলুম কি রকম।"

"তা হোক, চলুন না একটু ঘুরে আসি, ওদের সঙ্গে চুপটি করে বসে থাকতে আমার মোটেই ভাল লাগে না, আপনার মধ্যে প্রাণ আছে তাই আপনাকে আমার যত ভাল লাগে, অন্য কাউকে ততটা ভাল লাগে না।"

মুখে সুধাকে কিছু না বললেও মনে মনে বললুম জানি না এ ভাল লাগার অর্থ কি।

এদিক-সেদিক একটু ঘুরে ধর্ম্মশালায় ফিরে এসে দেখি ছড়িদার আমাদের দুজনের অপেক্ষা করছে। আমরা সকলে ছড়িদারের সঙ্গে মন্দির দর্শনে বেরিয়ে পড়লুম।

মন্দিরে ঢুকেই মনে হল বুঝি আমরা আবার মাতুরায় ফিরে এসেছি। দক্ষিণ ভারতের মন্দির যে এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, তা আমি আগে জানতুম না। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি আর ভাবি নিশ্চয় এ বোধ হয় মানুষের তৈরী নয়।

মন্দিরের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পথগুলি বিজলীর আলোয় মনে হল যেন মধ্যরাত্রে মানবশূন্য কোনও এক নীরব নগরীর রাজপথ। রামেশ্বর ও মাদুরার মন্দির যেন অবিকল একই ছাঁচে ঢালা। তবে কেউ কেউ বলেন, মাদুরার মন্দির রামেশ্বরের মন্দির থেকে কিছু বড়। সে যাই হোক দক্ষিণ ভারতের এই মন্দিরগুলি যদি একবার প্রদক্ষিণ করতে হয় তা হলে কয়েক মাইল হাঁটার কাজ হয়।

রাত্রে আর কি দেখব, সুধাকে বললুম, "চল এইবার বাড়ী ফেরা যাক, কাল দিনের আলোয় এখানকার যা কিছু সবই দেখে নেওয়া যাবে।"

সুধা জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারা কালই ফিরে যেতে চান নাকি?"

বললুম, 'সুধা, সব কিছু যদি দেখাই হয়ে যায় তাহলে মিছিমিছি ধর্ম্মশালায় পড়ে থেকে লাভ কি, বরঞ্চ কলকাতায় ফিরে তোমাদের বাড়ী গিয়ে রোজ তোমার নতুন নতুন রান্না খেয়ে আসব, তখন হয়ত তুমি চিনতেই পারবে না কি বল?"

সুধা উত্তর দিলে, "যান আপনি ভারি দুষ্টু আপনার সঙ্গে আর কথা কইব না।"

বললুম, "সুধা তুমি রাগ করলে, আমাকে তাহলে দেখতে পার না বল?"

সুধার গম্ভীর মুখ অমনি হাসিতে ভরে উঠল, পেছনে চেয়ে দেখি আর সকলে অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

পরদিন প্রাতঃকালে স্নান সেরে রামেশ্বরের যা কিছু দেখবার সবই দেখে শুনে ধর্ম্মশালায় ফিরে এলুম।

তীর্থ করতে না এলেও পাণ্ডাকে দক্ষিণা দিয়ে তীর্থগুরু স্বীকার করে তাদের জাবদা খাতায় নাম ও ঠিকানা লিখে দিলুম সঙ্গে সঙ্গে রায়মশাইও নাম ঠিকানা লিখে দিলেন। রামেশ্বরে এসে আমার কি ভাল লাগলো না লাগলো সুধা আমাকে তা জিজ্ঞাসা করে বসলো।

বললুম, "এই সেতুবন্ধ রামেশ্বর নিয়ে প্রকাণ্ড ইতিহাস লেখা আছে, রামায়ণ পড়লে অনেক কিছুই জানতে পারবে, মিছিমিছি আবার রামায়ণের আদিকাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত বলে কোনও লাভ হবে না। তবে যদি বল অনেকেই আসে, মন্দির দেখে চলে যায়, আমি কিন্তু আমার বাহ্যিক চোখ দিয়ে মন্দির দর্শন করিনি সুধা, আমার মনের চোখ দুটো দেখার সবটুকু রস নিঙ্‌ড়ে বার করে নিয়েছে। আজ এই বিংশ শতাব্দির যুগে মানব সভ্যতার ইতিহাসের কথা যতই ভাবি, ততই আমার মনে হয় যারা বিদ্যার বড়াই করেন তাঁরা বোধহয় পুরাকালের ইতিহাস একবারও পড়ে দেখেন নি!

সুধা জিজ্ঞাসা করলে, "তাহলে আপনি বর্ত্তমান সভ্যতাকে নিন্দা করেন?"

"নিন্দা আমি করি না, তবে এইটুকু বলতে চাই যে আমাদের দেশে অনেক বড় বড় আর্কিটেক্ট ও ইন্‌জিনিয়ারের মাথা ঘুরে উঠবে এই সব মন্দিরের নির্ম্মাণ নৈপুণ্য চিন্তা করতে, কারণ তাঁরা শক্তিশালী বিদেশী ডিগ্রিধারী পণ্ডিত।"

সুধা আর কোনও কথা বলল না কারণ ট্রেণের সময়ের আর বেশী দেরী ছিলনা। তাছাড়া আমাদের সেই দিনই ফিরতে হবে সুতরাং আমরা আমাদের যে যার তলপি তলপা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। তারপর প্রায় তিন দিন ট্রেণে কর্ম্মভোগের পর হাওড়ায় ফিরে এলুম, রায়মশাইকে বিদায় দেবার সময় তাঁর বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে এবং আমার ঠিকানা দিয়ে বাড়ী ফেরবার পথে ভাবতে লাগলুম সুধার কথা।

এখন আর দক্ষিণাপথের যাত্রী নই। কলকাতায় ফিরে এসেছি। শীতের আড়ষ্ট ভাবটা নেই বল্লেই চলে। বসন্তের মলয় বাতাস বইতে সুরু করেছে। গাছের ডালে কোকিলের কাকলী, নব মঞ্জুরিত মুকুলের মধু অন্বেষণে বন বিহগের কলগুঞ্জন মনটাকে বেশ সজীব করে তুলছিল। বসে বসে ভাবছিলুম সুধার কথা। এক এক করে মাদুরার ও রামেশ্বরের সব কথাই মনে পড়তে লাগল। বাড়ী ফেরার পথে সুধা অনেক করে

বলে দিয়েছিল যেন তাদের ভুলে না যাই। এমন সময় বাল্যবন্ধু অজিত এসে জিজ্ঞাসা করলে, "সুবোধ এখনও যে চুপটি করে বসে আছিস? আজ না তোর নতুন বান্ধবী সুধীরাদের বাড়ী যাবার কথা?"

উত্তর দিলুম, "ভাবছি ত তাই, বিদেশে কটাদিনের আলাপ শেষটায় হয়ত চিনতেই পারবে না সুতরাং ভেবে চিন্তে কাজ করাটাই কি ভাল নয় ভাই?"

"কিন্তু সুবোধ সেত আর পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা পর্দ্দানসীন মেয়ে নয় সুতরাং সেদিক দিয়ে তোমার ভাবনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। আর তাছাড়া যখন তার সব কিছুই তোমার ভাল লাগে তখন এ সুযোগ ছাড়া তোমার কোনও মতেই উচিত নয়।"

সুধার সম্বন্ধে আমার ওপর অজিতের এ রকম একটা মনোভাব বুঝতে পেরে বললুম, "অজিত, এ বিদ্রূপ তোমার মুখে শোভা পায় না।"

অজিত বললে, "রাগ করিসনি সুবোধ, বিদ্রূপ আমি মোটেই করিনি। তোর কোনও কথাই ত আর আমার অজানা নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এমনি করেই গড়ে ওঠে। আজ আমার কথাটা বিদ্রূপ বলে মনে হচ্ছে কিন্তু দুদিন বাদে ঐ সুধীরাই হয়ত হয়ে উঠবে তোমার পরম আত্মীয়া।"

বললুম, "অজিত, জানি সংসারে ভবিতব্যের কথা খুবই সত্যি এও বুঝি যে মানুষ মনে করে এক, হয় আর এক, উপস্থিত আমার সে চিন্তা নেই, তবে বিদেশে তাদের কাছ থেকে যে সেবা, যত্ন পেয়েছি তার দেনা যদি এমনি করে শোধ করতে হয় তাহলে আমি নাচার।"

অজিত বললে, "সুবোধ, তোর ওসব অন্ধ নাচারের কথা শুনতে চাই না। আমার মতে তাদের সঙ্গে দেখা কর, তারপর অনেক কিছুই বিবেচনা করা চলবে।"

অজিতকে বললুম, "তবে তুইও সঙ্গে চল।"

"সে হয় না, তাঁদের সঙ্গে আমাব কোনদিন আলাপ পরিচয় নেই তা ছাড়া তাঁরা হয়ত আমার যাওয়াটা পছন্দ নাও করতে পারেন।"

"অজিত, তাদের সঙ্গে জীবনে আমারও কোনদিন পরিচয় ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে এমনি করে গড়ে ওঠে একথা একটু আগে তোমার মুখেই শুনেছি তাহলে তোমার এত ভয় পাবার কারণটা কি?"

অজিতের আর না বলার কোনও উপায় ছিল না সুতরাং দু'জনে বেরিয়ে পড়লুম। ঠিকানা সঙ্গেই ছিল বাড়ী খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। রাস্তার ধারেই হাল ফ্যাসানের বেশ চমৎকার তিনতলা বাড়ী। রায়মশাইকে ডাকতেই সামনের বারান্দা থেকে আমাকে দেখেই সুধীরা তাড়াতাড়ি নীচে এসে বললে,

"আসুন, বাবা এইমাত্র বেরুলেন, পথ ভুলে এসেছেন নিশ্চয় ?

একটু হেসে বললুম, "খুব রাগ করেছ না ? এখন কিন্তু পথ আমার খুব ভাল করে জানা হয়ে গেছে তারপর অজিতের সঙ্গে সুধীরার পরিচয় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, সুধীরা তোমার বাবার সঙ্গে তাহলে আজ আর দেখা হল না, ফিরতে কি খুব দেরী হবে ? সুধীরা কোনও কিছু বলবার আগেই পুনরায় বললুম, আচ্ছা থাক, আজ না হয় ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে যাই আর একদিন এসে রায়মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে যাব।"

সুধীরা বেশ একটু অভিমান করে বললে, "তাহলে না এলেই ত পারতেন ? তারপর আমার অপেক্ষা না করেই অজিতকে বললে,—আপনি সুবোধদার যখন বন্ধু একটু দেরী হলে নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না ?"

অজিত বেশ ভালই জানত সুধীরার সঙ্গে দেখা করা ছাড়া আমার অন্য কোনও কাজ ছিল না। সুতরাং ভদ্রতার খাতিরে বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলে, "না, তাতে আর কি, আপনাদের তীর্থ পথের বন্ধু—।"

অজিতকে বাধা দিয়ে বললুম, "তবে তুই একটু বোস ভাই আমি চট করে সকলের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।"

সুধা আমাকে ওপরে তার নিজের ঘরে বসিয়ে, 'আসছি' বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে

বললে, "আপনাকে এখন কিন্তু ছাড়ছি না, বাবাও বেরিয়েছেন, ঠাকুমাও ভাগবৎ শুনতে গেছেন।"

মনে মনে ভাবলুম অজিতকে সঙ্গে এনে ভুল করেছি। বললুম, "সুধা, অন্য আর একদিন আসব। সেদিন যত পার আটকে রেখো। অজিতকে একলাটি বসিয়ে রেখেছি দেরী হলে মনে মনে হয়ত রাগ করবে।

সুধা বললে, "সে দোষ ত আপনারই, আপনিই ত তাঁকে নীচে অপেক্ষা করতে বললেন, বেশ চলুন নীচেই তাঁর সঙ্গে আজ না হয় আলাপ করা যাক।"

বললুম, "সুধা সে বড় লাজুক, মেয়েদের দেখলে মুখ দিয়ে তার কথাই বেরোয় না, সুতরাং তাকে আর মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে লাভ কি, চল মাকে গড় করে আজকের মত ফেরা যাক, তারপর আর একদিন এসে যত খুসী উৎপাত করে যাব তখন কিন্তু বিরক্ত হলে চলবে না, তা আগে থেকেই বলে রাখছি।"

সুধা উত্তর দিলে, "সুবোধদা মাদুরায় যাকে দেখেছিলেন তিনি আমার পিসিমা, কলকতায় ফিরেই তিনি চলে গেছেন। ছেলেবেলা মাকে হারিয়েছি, আমাদের সংসারে ভাই বলতেও আমি বোন বলতেও আমি, থাক নিজেদের দুঃখের ইতিহাস শুনিয়ে আর লাভ কি, ঘোড়ায় যখন জিন দিয়ে এসেছেন তখন তার ওপর ত আর কথাই চলে না।"

বুঝতে পারলুম সুধা খুব অভিমান করেই কথাগুলো বললে তাই পরক্ষণেই বেশ মিষ্টি কথায় বললুম, "সুধা তুমি অনর্থক রাগ কোরনা, তুমি ত জান নীচে অজিত এখনও অপেক্ষা করছে।"

সুধা মুখ ভার করে উত্তর দিলে, "তাহলে বিদেশের কুটুম্বিতে রক্ষা না করলেও দোষ আপনার কেউ দিত না।"

বললুম, "না, তুমি রাগই করেছ দেখছি আচ্ছা দেখি অজিতকে বলে, যদি সে একা কাজটা সেরে যেতে পারে তাহলে অনর্থক তোমার মনে কষ্ট দোবনা. ঠাকুমা ও রায়মশাই না ফেরা পর্য্যন্ত না হয় অপেক্ষা করেই যাবো।"

সুধা এক গাল হেসে বল্লে' "তাহলে দাঁড়ান চট করে চাটা অজিত বাবুকে পাঠিয়ে দি তারপর যা খুসী তাই করবেন।"

বল্লুম, "চায়ের কোনও প্রয়োজন নেই কারণ ও রোগের হাত থেকে অজিত নিস্তার পেয়েছে।"

"তা না হয় হল কিন্তু আপনি ত আর নিস্তার পান নি?" "সে জন্যে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না কারণ একটু আগে খেয়েই বেরিয়েছি। সুতরাং আর অপেক্ষা না করেই নীচে এসে অজিতকে সব বলতেই, যাবার সময় সে আমার হাতটা বেশ একটু জোরে নাড়া দিয়ে বল্লে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের এ রোমানেসর ফলাফল যেন শুভ হয়।"

অজিতকে নিরালায় বসে থাকার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে ওপরে এসে দেখি সুধা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত। বল্লুম, "সুধা শেষ পর্য্যন্ত তোমার জিদ্ই বজায় রইল কিন্তু আবার এ সব চা ফায়ের তোড়জোড় কেন? না তুমি নিতান্তই অবুঝ।"

সুধা হেসে উত্তর দিলে, "তাহলে শেষ পর্য্যন্ত অজিত বাবুকে তাড়িয়ে ছাড়লেন।"

"তার জন্যে দায়ী তুমিই ত সুধা।"

"সে কথা আমি আগেই জানতুম সুবোধদা, অজিত বাবুও আমার নামে অনেক কথাই বলবেন কারণ আমার জন্যেই যে তাঁকে এখান থেকে বিদায় নিতে হল তাত আর তাঁর জানতে বাকী রইল না।"

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে উত্তর দিলুম, 'সে জন্যে তোমার দুঃখিত হবার কোন প্রয়োজন নেই, বাঃ চা-টা ত' ভারী সুন্দর হয়েছে। সুধার হাতের চা, নামটা যেমন মিষ্টি চাও তেমনি না হলে চলবে কেন বল।"

"করার অভ্যাস নেই বলেই হয়ত খারাপ হয়ে থাকবে তাই বলে নাম নিয়েও ঠাট্টা করবেন তা আমি ভাবি নি। যা হোক এখন থেকে আমাকে সুধীরা বলেই ডাকবেন ও মিষ্টি নামে আর কাজ নেই।"

না! কথায় কথায় তোমার রাগ, আচ্ছা বেশ এখন থেকে

সুধীরা বলেই ডাকব' কিন্তু তোমাকে ঠাট্টা আমি মোটেই করিনি, সত্যি চা তৈরী চমৎকার হয়েছে, তুমি ভুল বুঝো না।"

"সে কি আর আমি জানি না সুবোধদা, আলু ভাতে নিয়ে মাদুরায় আমাকে যা করেছিলেন তা কি আমি এত চট করে ভুলে যাব'।"

বাধা দিয়ে বললুম, "সুধীরা ভালকে ভাল, আর মন্দকে মন্দ বলাই হচ্ছে মানুষের সাধারণ নিয়ম, কিন্তু তুমি যে মাদুরার সে কথাটা আজও মনে রেখে অভিমান করে বসে আছ সে জন্যে তোমার স্মরণ শক্তির তারিফ না করে থাকতে পারছি না।"

এমন সময় নীচে রায়মশাই ডাকলেন, "সুধা একবার নীচে আয় মা।"

"বাবা এসেছেন, একটু বসুন চট্ করে খবরটা দিয়ে আসি তারপর আপনার কথার জবাব আমি দোব।" বলিয়া সুধীরা নীচে নামিয়া গেল।

বসে বসে ভাবতে লাগলুম এই সুন্দর সরল সুধীরার কথা, আমার সঙ্গে কিসের এত ঘনিষ্ঠতা যে এমনি করে প্রাণ খুলে তার এত আলাপ ও অভিযোগ যাই হোক পর মুহূর্ত্তেই সুধীরা রায়-মশাইকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে আমার কাছে হাজির হতেই এবং আমার কিছু বলবার আগেই রায়মশাই বললেন, "সুবোধ তোমার নামে আমার একটা মস্ত নালিশ আছে।"

রায়মশাইয়ের কথা শুনে হঠাৎ মনটা যেন সাত হাত দমে গেল, ভাবতে লাগলুম কি এমন অন্যায় করেছি, জিজ্ঞাসা করলুম, রায়-মশাই, বলুন কি এমন নালিশ, যদি অন্যায় করে থাকি অবশ্যই শাস্তি গ্রহণ করব।"

রায়মশাই বল্লেন, "হ্যা শাস্তি গ্রহণ তোমাকে করতেই হবে, মস্ত বড় শাস্তি। তারপর সুধীরাকে বললেন, চাকরটাকে বল মা একটু তামাক দিয়ে যাক, তাছাড়া সুবোধের মত ফেরারী আসামীকে শাস্তি দিতে হলে বেশ একটু ভেবে চিন্তেই চার্জ্জ ফ্রেম করতে হবে।

বললুম, "রায়মশাই অন্যায় একটু হয়েছে—।"

রায়মশাই বাধা দিয়ে বললেন, "একটু অন্যায় নয় সুবোধ, কদিন ধরে তোমার খোঁজ নেবার জন্যে সুধা কি আমায় কম বলেছে কিন্তু এত বড় সহরে কোথায় তোমায় খুঁজী, ঠিকানাটা যে হারিয়ে ফেলেছিলুম সুধা ত আর জানতো না। তবে এটুকু জানতুম যে তুমি আসবেই কিন্তু এমনি করে কি বুড়োটাকে ভুলে যেতে হয় সুবোধ? ভাবলুম অসুখ বিসুখ হল না কি, দু' লাইন লিখেও ত খবর দিতে পারতে।"

সত্যই এ কথার উত্তর কি দোব' কারণ যারা এত ভালবাসে তাহাদের খোঁজ না লওয়া খুবই অন্যায় হয়েছে। যাই হোক রায়মশাইকে বললুম, "আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। অনেক দিন পরে কলকাতায় ফিরে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে আপনাদের মনোকষ্ট দিলুম।"

রায়মশাই হেসে উঠে বল্লেন, "আরে পাগলা ছেলে, অপরাধ আবার কি, কথাটা কি জান সুবোধ এক সঙ্গে এতদিন ঘুরে সত্যি তোমার ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। তোমাকে কাছ ছাড়া করতে কেমন যেন প্রাণে লাগে। আজ এই কটা দিন অনুপস্থিতির পরে তোমায় দেখে মনে হচ্ছে যেন কত বছর পরে তোমায় দেখছি— ।"

সুধীরা রায়মশাইকে বাধা দিয়ে বললে, "তাও কি সুবোধদা থাকতে চান, সঙ্গে ওর এক বন্ধু অজিতবাবু এসেছিলেন। জোর করে সুবোধদাকে আটকে রাখলুম কিন্তু অজিতবাবুর বিশেষ কাজের জন্যে বসলেন না। তবে তুমি বাড়ী থাকলে হয়ত আরও কিছুক্ষণ তাঁকে আটকে রাখা যেত।"

রায়মশাই বললেন, "তা তুমি মা তাকেও আটকে রাখলে পারতে ?"

আমি ত সুবোধদাকে বললুম, অজিত বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ কতটুকু কাজে কাজেই আমার অনুরোধের আর জোরই বা কি তাছাড়া তাঁর যখন বিশেষ কাজ তখন তাঁকে জোর করে আটকে রাখাও ঠিক নয় এই ভেবে তেমন কিছু বলতে পারলুম না।"

"তা ঠিক, আচ্ছা সুবোধ তুমি বাবা অজিত বাবুকে আর একদিন এখানে নিয়ে এস, যেন ভুলোনা, তারপর সুধীরাকে

বললেন, "ঠাকুরকে বলে দিয়েছিস ত' মা, যেন বেশ মন দিয়ে রান্না বান্না করে, সুবোধ যেন না খেয়ে যায় না।"

রায়মশাইয়ের ব্যবস্থা শুনে বললুম, "ওসব হাঙ্গামা আজ আর করবেন না কারণ আমাকে এখুনি উঠতে হবে বরং আর একদিন ওসব হবে।"

"সে সব আমি জানি না সুবোধ, সুধাকে জিজ্ঞাসা কর, তাছাড়া মারও ভাগবৎ শুনে ফেরার সময় হয়েছে। তিনি যদি শোনেন তুমি এসেছিলে আর তোমাকে না খাইয়ে ছাড়া হয়েছে তাহলে তিনি খুব রাগ করবেন।"

বললুম "তাহলে ত আপনাদের বাড়ী আসাই দায় দেখছি।"

সুধীরা জবাব দিলে, "দায় কিছু নয় সুবোধদা, বাড়ীতেও খাবেন, উপোস করে নিশ্চয় থাকবেন না?"

"সে কথা ঠিক কিন্তু বাড়ীর খাবারগুলো যে নষ্ট হবে তার জন্যে দায়ী হবে কে?"

"আপনার ও কথার কোনও মানেই হয় না সুবোধদা, এটাও ঠিক যে পাঁচজনের সংসারে নষ্ট কিছুই হয় না, সংসারের কিছু না জানলেও এ কথাটা ত আর কিছু মিথ্যে নয়?"

সুধীরার কথার জবাব দেবার আগেই রায়মশাই বললেন, "সুবোধ সুধার সঙ্গে যদি বোঝা পড়া করে পার ত' দেখ আমি আর তোমাদের ওসব ঝগড়ার ভেতর নেই, যা ভাল বোঝ কর।

আমি বরঞ্চ এই ফাঁকে নিবারণের ছেলেটাকে একবার দেখে আসি, শুনছি ক'দিন থেকে তার জ্বর হয়েছে, আজ নাকি আবার একটু বেড়েছে। তবে আমার ফেরার আগে যেন পালিও না সুবোধ-বাবু বুঝলে ?"

বললুম, "বেশ ত সুবোধ বলেই ডাকছিলেন, বাবুটীকে আবার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন কেন ?"

রায়মশাই, হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, "তোমাদের মত বয়েসে আমরাও ওরকম বাবু ছিলুম হে, তা বেশ সুবোধ-ই না হয় হল কিন্তু সুবোধ ছেলেটির মত ততক্ষণ সুধার সঙ্গে গল্প-টল্প কর আমি ছেলেটাকে দেখেই আসছি, নিবারণ অনেক দিনের বাল্যবন্ধু আর তাছাড়া মারও ফেরার সময় হয়েছে।"

রায়মশাই বেরিয়ে গেলে, সুধীরাকে বললুম, "তুমি ভারী অবুঝ, এমনি করে যদি জব্দ কর তাহলে আমি এবার থেকে চিঠি লিখেই খালাস কিন্তু।"

সুধীরা হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, "আচ্ছা সে দেখা যাবে, আমি আপনার চিঠির উত্তরই দোব না। এই বুঝি আপনার ভালবাসা ? আমাদের একটী কথা রাখতেই আপনার যত আপত্তি ?"

"সুধীরা সত্যি, তোমরা পুরুষের কাজের দিকটা মোটেই ভেবে দেখ না অথচ একটু বল্লেই অমনি মুখ তোলো হাঁড়ি করে

একবারে রাগের একটা প্রকাণ্ড দেবী সেজে বসো, এ কিন্তু ভারী অন্যায়।"

"পুরুষরা অই রকমই হয় সুবোধদা, মেয়েছেলের দুঃখু যদি তারা বুঝতো তাহলে সংসারে জঞ্জাল বলে কোনও জিনিষই থাকত না। বেশ ত আপনি যান না, আমি ত আর আপনাকে ঘরে আটকে রাখিনি। মনে করব, আপনার সঙ্গে আমাদের কোনও পরিচয়ই নেই।"

"এ কিন্তু তোমার রাগের কথাই হচ্ছে সুধীরা। তোমাদের এখানে খেলে আমার জাত যাবে না, সুতরাং আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, এর পর এলে যত পার খাইও আমি কোনও দিনও তাতে আপত্তি কোরবো না। আজকের দিনটা আমাকে রেহাই দাও সুধীরা।"

এতগুলা কথা বলে গেলাম কিন্তু সুধীরার তরফ থেকে হ্যাঁ, না কোন জবাবই পাওয়া গেল না। বুঝতে পারলুম সুধীরা আমাকে খাওয়াতে পারলে খুবই খুসী হয় তবুও আর একবার জিজ্ঞাসা করলুম, "কি চুপ করে রইলে যে?"

সুধীরা উত্তর দিলে, "যা বোঝেন করুন, বলার যা তা আগেই বলেছি এখনও তাই বলছি। সত্যিই আপনি আমাদের বাড়ী খাবেন কেন?"

সুধীরাকে বাধা দিয়ে বললুম, "ইচ্ছে করে সব জিনিষ ভুলে

যাও কেন। মাদুরা আর রামেশ্বরে অতদিন ধরে রোজ রোজ কে খেয়েছিল ?"

সুধীরা উত্তর দিলে, "ওসব কথা ছেড়ে দিন পথে প্রবাসে নিত্যই ওরকম কত ঘটছে তাই বলে পুরোনো একটা নজির দেখিয়ে আজকের দিনের বিচার করা চলে না সুবোধদা।"

বললুম, "বেশ তবে এইখানেই দাঁড়ি টানলুম, কারণ যে অবুঝ তাকে বুঝিয়ে কোনও লাভ নেই, এখন তোমার যা খুসী কর আমি কোনও আপত্তিই কোরব না, সুধীরা।"

সুধীরার গম্ভীর মুখখানা হাসিতে ভরে উঠল, তারপর 'এক মিনিট' বলেই নীচে নেমে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বল্লে, "সুবোধদা, বেশ ভাল করে ভেবে দেখুন আমার দ্বারা আপনার কোনও অনিষ্ঠ হবে না ত ?"

বললুম, "সুধীরা অনিষ্ঠ হলেও কোনও উপায় নেই কারণ যখন তুমি আমার সময়ের মূল্যটুকু বুঝলে না তখন তোমার ইচ্ছামত কাজ না করলে হয়ত তুমি মনে কষ্ট পাবে।"

সুধীরা বাধা দিয়ে বললে, "সুবোধদা, আমার অনুরোধে কিম্বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমি আপনাকে কোনও কাজ করতে বলি না, কারণ নিজের বিবেক বুদ্ধির প্রেরণায় কাজ করে মানুষ যে সুখ পায় কিন্তু অন্যের অনুরোধে তা পাওয়া সম্ভব নয়।"

"ওকথা তুমি কেন বলছ সুধীরা ? এমনি করে কথায় কথায়

রাগের পালা সুরু করবে জানলে কখনই আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতুম না। সত্যই যদি তুমি আমাকে খাইয়ে আনন্দ পাও তবে সে আনন্দ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করে লাভ কি ? সুতরাং তোমাকে কথা দিচ্ছি, না খেয়ে এখান থেকে একটী পাও নড়ব না।"

"তবু ভাল যে এতক্ষণে মতটা বদলালো।" বলেই সুধীরা আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলতেই বললুম, "শেষ পর্য্যন্ত জিদ বজায় রেখে তবে ছাড়লে।" পাশ করা মেয়ের কাছে আমাদের কি আর পারবার যো আছে ?"

সুধীরা বেশ কড়া সুরেই প্রতিবাদ জানাবার সময়েই নীচে ঠাকুমা "সুধা" বলে ডাকতেই সুধীরা উত্তর দিল, "ঠাকুমা কে এসেছে দেখবে এস।"

ঠাকুমা একেবারে সটাং ওপরে এসে ঘরে ঢুকে বললেন, "ওমা এ যে সুবোধ, তবু ভাল এতদিন বাদে তাহলে আমাদের মনে পড়েছে ?"

ঠাকুমাকে একটা প্রণাম ঠুকে "বললুম, বুঝতেই ত পারছেন কলকাতায় এসে পর্য্যন্ত মরবারও অবকাশ পাইনি। অনেকক্ষণ এসেছি, আপনার সঙ্গে দেখা না করে যাবো না বলেই ত এতক্ষণ বসে আছি।"

সুধীরা অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "সুবোধদার কথা শুনোনা

ঠাকুমা, জোর করে আটকে রেখেছি, এসেই বল্লেন, "আজ যাই আর একদিন আসব'।"

ঠাকুমা বল্লেন, "কি করবে বল, কতদিন বাদে কলকাতায় ফিরেছে, কত বন্ধু-বান্ধব, কাজ কর্ম্ম সবই ত' আছে, তোর বাপের সঙ্গে দেখা হয়েছে ত' ?"

সুধীরা জবাব দেবার আগেই উত্তর দিলুম, "রায়মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে ঠাকুমা, তিনি এখানে কার অসুখ, তাকে দেখতে গেছেন।"

ঠাকুমা বললেন, "নিবারণের ছেলেটা আজ কদিন থেকে জ্বরে ভুগছে তাকেই তবে দেখতে গেছে। আর বল কেন অসুখ বিসুখ ওদের বাড়ীতে লেগেই আছে। তোমাদের সব খবর ভাল ত' সুবোধ ?"

হ্যা "ঠাকুমা আপনার আশীর্ব্বাদে সব ভালই, আপনার শরীর বেশ ভাল আছে ত' ?"

"আর বাবা বুড়ো বয়েসের শরীর, তোমরা সব সুখে স্বচ্ছন্দে থাকলেই আমার ভাল, তা বেশ যখন এসেছ, খাওয়া দাওয়া না করে যেন চলে যেও না বাবা। ততক্ষণ সুধার সঙ্গে গল্প টল্প কর, রাস্তার কাপড় চোপড় গুলো ছেড়ে আসি, ত্রিলোচনও আসে এই।"

ঠাকুমা নীচে নেমে গেলেন। ঘরের ভেতর চুপ করে শুধু এই

কথাই ভাবতে লাগলুম, যে সুধীরার মান অভিমানের কথাগুলোই আমাকে যেন জোর করে এখানে বসিয়ে রেখেছে। নিতান্ত না খেয়ে যাওয়াটাই হয়ত অভদ্রতা, এমন সময় সুধীরা জিজ্ঞাসা করলে, "কি চুপ করে বসে রইলেন যে?"

"কি করব বল, আমি ত' অনেক আগেই যেতে চেয়েছিলুম, কিন্তু তুমি মুখ ভার করে রইলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার মান অভিমানের পালা সুরু হ'ল সুতরাং চুপ করে বসে থাকা ছাড়া যাবার উপায় ত' দেখছি না।"

"সত্যি সুবোধদা আমি বুঝতে পারছি আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন কিন্তু আপনাকে পেলে মোটেই ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না, জানি না হয়ত' আপনার সরল সহজ মধুর ভালবাসাই এর জন্যে দায়ী।"

আমার আর উত্তর দেওয়া হ'ল না কারণ সেই সময় রায়মশাই ঘরে ঢুকে বললেন, "সুবোধ দেরী হয়ে গেল না?"

সঙ্গে সঙ্গে সুধীরাও জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা নিবারণ কাকার ছেলে ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ মা, আজ একটু ভালই, ডাক্তার বলে গেছে 'আর কোনও ভয় নেই', তুমি মা এইবার সুবোধের খাওয়ার ব্যবস্থাটা করে ফেল; মা নীচেই রয়েছেন দেখলুম, দেরী করোনা সুবোধকে আবার অনেকখানি যেতে হবে।"

সুধীরা একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে, "এমন কি রাত হয়েছে" বলে নীচে নেমে গেল।

সে রাত্রে সকলের অনুরোধে ও যত্নে খাওয়াটা একটু বেশীই হয়ে গেল। ফেরবার সময় সুধীরা আমাকে দিয়ে একরকম জোর করেই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে যে কাল তাদের বাড়ী আসতেই হবে। তাই চলার পথে ভাবতে লাগলুম তবে সত্যই কি সুধীরা আমার জীবন পথের একটা বোঝা হয়ে দাড়াবে? জানি না কোথায় এর শেষ। শোবার উদ্যোগ করছি, কাছেই ক্লাবের ঘড়িটায় ঢং ঢং করে এগারটা বেজে গেল।

পরের দিন সকাল বেলা বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজখানা উল্‌টে পাল্‌টে দেখছি হঠাৎ অজিত এসে প্রশ্ন করলে, "তারপর সুবোধ কালকের রোমান্স কতদূর এগুলো?"

বললুম, "অজিত যা ভাবছিস তা কিছুই নয়, সংসারে মানুষ মানুষের সঙ্গে যেমন আলাপ ব্যবহার করে থাকে ঠিক তেমনি।"

অজিত হাসতে হাসতে বললে, "সে কি সম্ভব, যে রকম মতলব করে আমায় তাড়ালি, এরপরও কি তোমাদের মনোভাব অন্য কিছু ভাবা যায়?"

"তুমি যদি বিশ্বাস না কর তাহলে আমি নাচার।"

"কি করে বিশ্বাস করি বল, কারণ তোমার সুধীরাকে যেটুকু দেখবার অবকাশ পেয়েছি তা থেকে শুধু এইটুকুই বুঝেছি যে তার অন্তরাত্মা তোমাকেই পূজা করে।"

হেসে উত্তর দিলুম, "তোমার গভীর গবেষণা, মনস্তত্ত্ব-বিদকেও হার মানিয়েছে অজিত, তুমি একজন সমজদার বটে।" "সুবোধ ঠাট্টা কর তাতে দুঃখুর কিছু নেই, আমি সত্যি কথাই বলেছি।"

বল্লুম, "অজিত একজন শিক্ষিতা নারীর ভালবাসা যাচাই করা বড় শক্ত। আমার মত একজন অজ্ঞাত কুলশীলকে কেন সে পূজো করবে সেটা বোঝা অত সোজা নয় ভাই।"

"খুবই সহজ, খুবই সরলকারণ সে তোমার আত্মীয় নয়, প্রতিবেশীও নয় তবে তার ওপর তোমার কিম্বা তোমার ওপর তার এত আকর্ষণ কিসের আমায় বুঝিয়ে বলতে পার ? বন্ধু সব জানি সব বুঝি, কোথায় যে দরদ তা এ শর্ম্মার আর জানতে বাকী নেই। শুধু তার চোক দুটো দেখেছি আর অমনি মনে হয়েছে সে চোখ দুটো তোমাকে কি যেন নিবেদন করতে চায়, চট করে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না কারণ সাধারণ মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী লেখাপড়া সে শিখেছে।"

বললুম, "অজিত তুই ভুল বুঝেছিস, সে আমাকে কখনই ভালবাসতে পারে না।"

"পারে বন্ধু পারে, এমনি করেই নর ও নারীর অন্তরে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই গড়ে ওঠে প্রেম।"

"জানি না সুধীরার অন্তরে ফল্গুর মত কোনও প্রেম-ধারা প্রবাহিত আছে কিনা কিন্তু আজও আমি তার মনের গোপন কথা কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি।"

"ঐ খানেই ত মানুষের দরদ, ঐ খানেই ত তার আকর্ষণ, যাক ওসব কথা, এখন জিজ্ঞাসা করি আজও কি সুধীরাদের বাড়ী যাওয়া হচ্ছে?"

"অজিত মিথ্যে বলে লাভ কি, কাল ফেরার সময় সে জোর করে আমার কাছে কথা নিয়েছে যে আজও তাদের বাড়ী যাবো।"

"সুবোধ আমি জানি তুই না গিয়ে পারিস না, যাই হোক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সুধীরার সংস্পর্শে তোমার জীবন সার্থক হয়ে উঠুক।"

অজিতের কথা শুনে শুধু তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম, কোনও কথাই বলতে পারলুম না। মনে হ'ল যেন আমি বাক-শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।

"এতে লজ্জা কিম্বা দোষের কিছু নেই ভাই, এমনি করেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। যুগ যুগান্তর ধরে এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি তোমার

বেলায় ও ঘটবে না। আমার মনে হয় পৃথিবীতে এইটেই সব চেয়ে সত্যি ও আকর্ষণের বস্তু।"

"অজিত তুমি হয়ত ঠিকই বলছ, কিন্তু আমি আজও বুঝে উঠতে পারছি না এর পরিণতি কোথায়। মনে হচ্ছে কি জান, যে আমি আমার সব কিছুই হারিয়ে ফেলেছি কাউকে ভালবাসার মত শক্তিও যেন আমার নেই।"

"সুবোধ, মানুষের মনের অজ্ঞাতসারেই প্রেম জেগে ওঠে এবং তখন তার মাদকতা শক্তির মোহ হয়ে ওঠে প্রখর, তখন মানুষ হয়ে যায় অন্ধ, ভাল মন্দের বিচার-শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে। সুতরাং তোমাকে আশ্রয় করে যে জীবন গড়ে উঠতে চায় তাকে তুমি বাধা দিওনা।"

অজিতের কথায় হ্যা, না কিছুই বলতে পারলুম না। মনে হতে লাগল যদি অজিতের কথা সত্যিই হয় তাহলে এ ভালবাসার ছোঁয়াচ থেকে কেমন করে নিজকে বাঁচাবো।

অজিত বল্লে, "সুবোধ ভাবনা করে লাভ নেই তবে এইটুকু মনে রেখে দিও যেন কিছু অন্যায় কিম্বা অশোভন না হয়, আজ আমি চললুম পরে আবার দেখা হবে।"

অজিতের কথাগুলো মনটাকে একবারে তোলপাড় করে দিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলুম আজ আর কোনও মতেই সুধীরাদের বাড়ী যাবো না। যথা সময়ে স্নানাহার সেরে বিছানায়

শুয়ে বর্ত্তমান মাসের ভারতবর্ষটা উলটে পালটে দেখতে দেখতে কখনও যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম তার কোনও হুসই ছিল না। হটাৎ ঘুম ভাঙ্গতেই ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি পাঁচটা বাজবার বিশেষ দেরী নেই। বাইরে পশ্চিম দিকে আকাশের গায়ে কালো মেঘের তলায় সূর্য্য লুকিয়ে গিয়েছে, কালবোশেখীর ঝড় তুমুল নৃত্য স্থরু করে দিয়েছে, থেকে থেকে বিদ্যুৎ লিক লিক করে জ্বলে উঠছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের গুরুগম্ভীর ডাকে দিগন্ত কেঁপে উঠছে। ভাবলুম যাক ভালই হল, যাওয়ার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেল। কিন্তু জানি না কোথা থেকে একরাশ দুর্ব্বলতা এসে আমাকে আঁকড়ে ধরলে, চুপ করে আর ঘরের ভেতর বসে থাকতে পারলুম না। বিবেকের সকল যুক্তি তর্ককে দূরে ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। স্থধীরাদের বাড়ী এসে দরজায় ঘা দিতেই, চাকর দরজা খুলে দিতে জিজ্ঞাসা করলুম, "হ্যারে বিধু রায়মশাই বাড়ী আছেন ত' ?"

বিধু কোনও কিছু বলবার আগেই স্থধীরা ওপর থেকে 'আস্থন স্থবোধদা ওপরে আস্থন' বলতে বলতে নীচে নেমে আসতেই জিজ্ঞাসা করলুম, "রায়মশাই বাড়ী নেই বুঝি ?"

স্থধীরা আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললে, "স্থবোধদা একি ভিজে যে একেবারে নেয়ে উঠেছেন, তাড়াতাড়ি আগে কাপড় জামাটা ছেড়ে ফেললুন দেকি।

"সুধীরা রায়মশাই আর ঠাকুমা কাউকেই ত দেখছি না তবে তাঁরাও কি আমার মত এই দুর্য্যোগ মাথায় নিয়ে বেরিয়েছেন ?"

"বাবা অনেক আগেই একটা দরকারে কালীঘাট গেছেন ফিরতে হয়ত' দেরী হতেও পারে, আর ঠাকুমা আপনি ত' জানেন একদিনও তার ঠাকুরের আরতি দেখা বাদ যাবার উপায় নেই।"

"সুধীরা, সেকালের মানুষ ঠাকুর দেবতা পেলে আর কিছু যেন চান না।"

"বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে ও জিনিষটা আপনিই এসে পড়ে একথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন সুবোধদা ?"

হাসতে হাসতে বললুম, "ভুল তা হবে তা না হলে এই দুর্য্যোগ মাথায় করে তোমাদের বাড়ী ছুটে আসি সুধীরা ?"

"সেটা আপনার মহানুভবতা, আমাদের ওপর একটা ভালবাসার টান।"

"সুধীরা যারা মহৎ তারা সকলকেই এ পৃথিবীতে মহৎ ভাবে কিন্তু যাই বল না কেন এ দুর্য্যোগ মাথায় নিয়ে বেরুবার কোনও ইচ্ছেই ছিল না কিন্তু তবুও কেন জানি না হটাৎ তোমার জন্যে মনটা কেমন করতে লাগল তাই বাড়ী ছেড়ে একটীবার তোমাকে দেখবার জন্যে এই দুর্য্যোগেও বেরিয়ে পড়লুম।

সুধীরা উত্তর দিলে, "সে সৌভাগ্যের জন্যে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার শক্তি পর্য্যন্ত আজ হারিয়ে ফেলেছি

সুবোধদা। পূর্ব্বজন্মে হয়ত' এমন কিছু সুকৃতি ছিল যার ফলে আপনার মত উদার ও মহৎ ব্যক্তির করুণার পাত্রী হবার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছি।"

সুধীরাকে বাধা দিয়ে বল্লুম, "থাক সুধীরা অনেক হয়েছে আর আমাকে বেশী উচুতে ঠেলে তুলো না কারণ পড়লে প্রাণে বাঁচা হয়ত' দায় হয়ে উঠবে।"

"যার যেটুকু প্রাপ্য তাকে সেটুকু দিয়ে দেওয়া কি অন্যায় বলে মনে করেন সুবোধদা ?"

উত্তর দিলুম, "ন্যায় অন্যায়, দেনা-পাওনা কোনও কিছুর মধ্যে নেই সুধীরা, তোমাকে ভাল লাগে আর তোমরা ভালবাস বলেই এই দুর্য্যোগ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম।"

সুধীরা কিছুক্ষণ কি একটা ভেবে বল্লে, "আমাকে ভাল লাগে এটাকি আপনার মনের কথা ?"

সুধীরার প্রশ্নের উত্তর দিতে যেন একরাশ কুণ্ঠা গলাটাকে চেপে ধরলে, উত্তর দিতে পারলুম না। সুধীরা বল্লে, "কি চুপ করে রইলেন যে ? উত্তর দিন।"

বললুম, 'সুধা ভাল লাগে কিনা সেটাও কি আমার মুখের কথায় তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে ? মানুষের অন্তরটা কি তার যথেষ্ট প্রমাণ নয় ?"

একথার উত্তরে সুধীরা বেশ জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল।

চেয়ারের হাতলে হাতের ওপর মাথা রেখে বসে রইলুম।

সুধীরা বেশ একটু ব্যস্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলে, "অমন চুপ করে বসে রইলেন যে, মাথাটা ধরলো বুঝি ?"

মাথা না তুলেই উত্তর দিলুম, "ও অমন মাঝে মাঝে আমার হয়, তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই আর তাছাড়া আমাদের মত লোকের সংসারে থাকা না থাকার কোনও মূল্য আছে বলে ত' আমার মনে হয় না সুধীরা।"

সুধীরা বেশ একটু রাগত ভাবেই বল্লে, "দেখুন সুবোধদা আপনি দয়া করে ওসব কথা আর শোনাবেন না ওতে আমার মন সত্যিই বড় খারাপ হয়ে যায়।"

"সুধীরা আমার ওপর রাগ করে অনর্থক নিজের মনটাকে খারাপ করে লাভ নেই। দুঃখ পাও এমন কথা নাই বা বল্লুম।"

"যান, আমি বুঝি আপনাকে ঐ কথাই বলছি। নিজেই ত' বড় বড় কথা বলছেন, সংসারে আপনাদের মত লোকের দরকার আছে কি না আছে; আপনি তার কি বুঝবেন।

"এইবার তুমি ঠিক বলেছ সুধীরা, আমার দরকার আমি বুঝবো না, বুঝবে কেবল তুমি, না ?"

সুধীরা উত্তর দিলে, "হ্যাঁ আমিই শুধু বুঝব অন্য কারুর বোঝার প্রয়োজন আছে বলে অন্ততঃ আমি মনে করি না।"

একটু হেসে উত্তর দিলুম, "থাক আর রাগের প্রয়োজন নেই এখন থেকে আর কোনও জিনিষই বোঝবার চেষ্টা করবো না।"

দিনের পর দিন এমনই আনন্দের ভেতর দিয়ে কেটে চলে। সুধীরাকে না দেখে একটী দিনও যেন থাকবার উপায় নেই।

দু'মাস পরের কথা, একটা পর্ব্ব উপলক্ষে সেদিন আফিস কাছারী ছিল সব বন্ধ। দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর অজিতের সঙ্গে পরামর্শ করছিলুম অন্ততঃ দুচার দিনের জন্যে কোনও জায়গা থেকে একটু ঘুরে আসা যায় কিনা।

অজিত হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, "সুধীরাকে ছেড়ে তুই যে একটা দিনও কোথাও যেতে পারিস এ ত আমার বিশ্বাস হয় না।"

প্রতিবাদ জানিয়ে অজিতকে কিছু বলার চেষ্টা করতেই হঠাৎ ঘরের ভেতর রায়মশাই এসে বললেন, "আজ আমার খুব বরাত জোর, তোমাদের দু'জনকেই একসঙ্গে পাব এ আশা করিনি যাক ভালই হল একটা কথা বলতে এলুম।"

অজিতের সঙ্গে পূর্ব্বেই একদিন রায়মশাইয়ের আলাপ হয়েছিল সুতরাং অজিত বেশ যত্ন করে রায়মশাইকে বসিয়ে

জিজ্ঞাসা করলে, "এমন কি জরুরী কথা রায়মশাই যে এই দুপুর রোদে কষ্ট করে বলতে এলেন ?"

রায়মশাই বললেন, "না এসে কি করি বল, ভেবেছিলুম সুধা আই, এ পাশ করুক, কিন্তু মার তাগাদার জ্বালায় এই দুপুর রোদে তোমাদের কাছে দায় জানাতে এলুম। এখন তোমাদের সাহায্য ছাড়া আমার আর যে কোনও উপায় নেই।"

রায়মশাইয়ের কথা শুনে বুঝতে আর বাকী রইল না যে সুধীরার বিবাহের জন্যে তিনি বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

আমি আর কোনও কথা বললুম না। অজিত উত্তর দিলে, "তা এই দুপুর বেলায় এত ব্যস্ত হবার কি আছে। আমাদের কি করতে হবে বলুন, আমরা তা অবশ্যই কোরবো।

রায়মশাই বললেন, "তোমাদেরই সব করতে হবে, পাত্র যে দু'চার যায়গায় সন্ধান না করেছি তা নয় তবে—"

রায়মশাইকে বাধা দিয়ে অজিত জিজ্ঞাসা করলে, "সেগুলি বুঝি পছন্দ হচ্ছে না ?"

"না ঠিক তা নয়, মার বড় ইচ্ছে সুবোধের সঙ্গে হলেই যেন ভাল হয়। মনে করেছিলুম সুবোধকে একথা একদিন বলব, কিন্তু পাছে সুবোধ মনে করে যে তার আলাপের সুযোগ নিয়ে সুবিধা খুঁজছি, এই ভেবে কথাটা এতদিন বলতে পারিনি কিন্তু সুধীরার মনভাব যখন কিছু কিছু শুনলুম তখন তোমাদের

সে কথা জানানো ছাড়া আমার আর অন্য কোনও উপায় নেই।"

সমস্ত শুনে অজিত আমার মুখের দিকে তাকাতেই রায়মশাই অজিতকে আবার বললেন, "অজিত আমার এই কন্যাদায়ে একটু সাহায্য না করলে চলবে না—।"

রায়মশাইকে বাধা দিয়ে অজিত বল্লে, "ব্যস্ত হবার কি আছে, ভবিতব্য থাকলে ভগবানের বিধান নড়চড় কোনও মতেই হবে না।"

"মেয়ের বাপ বলেই ওটা বুঝেও বুঝে উঠতে পারি না অজিত সব যেন গোলমাল হয়ে যায় তাই পাঁচজনের সাহায্য হয়ে পড়ে একান্ত প্রয়োজন।"

অজিত উত্তর দিলে, "সে জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না, আমার দ্বারা যেটুকু হবার তা হবেই।"

অজিতের কথায় রায়মশাই কতকটা আশ্বস্ত হয়ে সেদিনের মত বিদেয় নিলেন।

রায়মশাই চলে গেলে, অজিত বেশ একটু রসিকতা করে বল্লে, "সুবোধ একেই বলে লাক্ কোথায় লাগে রেঞ্জার্সের লটারী, কিন্তু ভাই চালটা যাহোক চাললি বটে ?"

বল্লুম, "তার মানে ? এর ভেতর চাল টাল কিছুই নেই, আমাকে অতটা বেহায়া ভাবিসনি অজিত।"

অজিত হাসতে হাসতে বললে, "পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ কেন ভাই ?"

উত্তর দিলুম, "অজিত সব কথা না হয় মেনেই নিলুম, সুধীরাকে ভালবাসি এও হয়ত সত্য কিন্তু তাই বলে বিবাহের সম্বন্ধ এটা একেবারে যেন একটা এ্যাক্সিডেন্টের মত নয় কি ?

অজিত বলে উঠল', "এই কথাই ত' আমি জানতে চাই, যাক তাহ'লে তুমি এ বিবাহে অরাজী নও ? কিন্তু—"

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলুম, "বিয়ে ? কি বলছিস অজিৎ ?"

"একেবারে যে গাছ থেকে পড়ছিস্, হেয়ালী ছাড় মনের কথাটা খুলে বলে দাও কারণ শুধু শুধু একজন নিরীহ ভদ্রলোককে হায়রাণ করে কোনও লাভ হবে না।"

"অজিত অন্যায় করেছি, সুধীরার সঙ্গে পরিচয় না হলেই ভাল হোত'। কিন্তু আজ কেমন করে বলব' পারবো না, সে যে আমার সব খানি অন্তর দখল করে বসে আছে।"

অজিত বেশ একটু গম্ভীর হয়ে বললে, "বেশ তাহলে আমি কালই রায়মশাইকে পাকা কথা দিয়ে আসব', দেখ শেষটা কিন্তু কথার নড়চড় না হয়।"

বেশ সংযত হয়েই উত্তর দিলুম, "অজিত তুই ত সব জানিস ভাই, কিন্তু তবুও কি আমাকে প্রেমের চক্রান্তে পড়ে মিথ্যেবাদী হতে বলিস্ ?"

"সুবোধ আমি জানি তোমার বাবা মারা যাবার পর তুমি নির্ম্মল বাবুকে কথা দিয়েছিলে তাঁর মেয়ে বীণাকে বে করবে কিন্তু আজ আর সে কথা তোমার থাকবে না এই ত ? কিন্তু সুবোধ সব সময় এ কথাটা যেন ভুলে যাসনি যে ভালবাসার কাছে কোনও যুক্তি তর্কই খাটে না আর এ কথাও হয়ত' মিথ্যে নয় যে সুধীরার মত একজন শিক্ষিতা কুমারী তোমাকে নিঃস্বার্থে ভালবাসেনি। সুতরাং তার আজীবনের অত বড় একটা সাধনাকে অপরের চোখে ক্ষুণ্ণ করে তুমি পুরুষ হয়ে কেমন করে আর একজন সম্পূর্ণ অজানা অচেনাকে টেনে আনছ, যা সম্পূর্ণ আমার চিন্তা শক্তির বাইরে।

মনটা একটা ভীষণ ভাবনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, অজিতকে বললুম "ভাই আমায় একটু ভাববার সময় দাও।"

"বেশ না হয় দু' একদিন বাদেই তোমার ভাবার ফলাফলটা জানিও" বলে অজিত তখনকার মত বিদায় নিলে।

অজিত চলে যাওয়ার পর সত্যি সত্যিই মনটা খুবই চঞ্চল হয়ে উঠল কারণ একদিকে সুধীরার ভালবাসা আর একদিকে কথার মূল্য, আমাকে বিশেষ ভাবে বিচলিত করে তুললে। সেদিন থেকে সুধীরাদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দিলুম।

এমনি করে পুরো তিনটে দিন কেটে গেল। অজিতকে আজ পাকা কথা দেবার দিন। সকাল বেলায় অজিতের অপেক্ষায় বসে

বসে শুধু সেই কথাই ভাবছিলুম এমন সময় পিয়ন পত্র দিয়ে গেল আমারই চিঠি সুধীরা লিখেছে।

পূজনীয়েষু, সুবোধদা,

বাবা না বুঝে একটা ভুলই না হয় করেছেন তাই বলে আমার ওপর এমনি করে প্রতিশোধ নিতে হয়? দু'জনের মাঝখানে কি আছে না আছে তা আমি জানতে চাই না, শুধু এইটুকু আজ আমি জানিয়ে দিতে চাই যে তোমার অন্তরে ব্যথা পায় এমন কিছু করতে তোমায় আমি কোনও দিনও অনুরোধ করবো না। না জেনে অপরাধ করার শাস্তি তুমি আমায় যথেষ্টই দিয়েছ। ক্ষমা ভিক্ষার জন্যেও অন্ততঃ একটী বার তোমাকে কাছে পেতে চাই, এই আমার শেষ মিনতি। প্রণাম নিও। ইতি—

সুধীরা।

পত্রখানা পড়ে সত্যিই খুব কষ্ট হল, অকপটে ভালবাসাই কি তার অপরাধ এই কথাই শুধু ভাবতে লাগলুম এমন সময় অজিত এসে জিজ্ঞাসা করলে, "সুবোধ ভাবার ফলাফলটা কি এইবার জানতে পারি?

কোনও কিছু না বলে অজিতকে সুধীরার পত্রখানা দিয়ে বললুম, "পড়ে দেখ।"

পত্রখানা পড়ে অজিত বল্লে, "সত্যি তার দুঃখ হবারই কথা,

শেষ পর্য্যন্ত যখন তাকে বিয়েই করতে হবে তখন ভালমানুষটীর মত চুপটী করে গা ঢাকা দিয়ে থাকার আমি ত কোনও মানেই বুঝি না।"

"অজিত তুইও শেষে আমার ওপর চটে যাচ্ছিস?"

"না সুবোধ তোমার এ ব্যবহার আমি মোটেই সমর্থন করতে পারি না।"

"অজিত তুই বুঝতে পারছিস না, বীণার কথাটা এত চট্ করে কেন ভুলে যাচ্ছিস ভাই।"

"তাই যদি হবে তবে সুধীরাকে মাঝ পথে টেনে আনার কি প্রয়োজন ছিল সুবোধ? অন্ধ বিশ্বাসে একজন যখন তার সমস্ত ভালবাসা টুকু উজাড় করে তোমায় বিলিয়ে দিলে তখন ভাবনা হল বীণার জন্যে, যাকে চোখে দেখার সুযোগ আজও তোমার হয়ে ওঠেনি, সেই বীণার জন্যে আজ তোমার এত দরদ?"

"অজিত আমিই অপরাধী, যাক বলার আমার কিছুই নেই আজই আমি পুরী যাব, রথের আগে কলকাতায় ফিরবো না, সুধীরার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না, তাছাড়া সময়ও নেই, ফিরে মতামত জানাবো, রায়মশাই এলে এই কথাই তাকে বলে দিও।"

"সুবোধ অদ্ভুত তোমার খেয়াল যা ভাল বোঝ কর, শেষ পর্য্যন্ত আমাকে আর নিমিত্তের ভাগী কোরোনা, এই আমার অনুরোধ।"

সেই দিনই পুরী যাত্রা করলুম। প্রায় এক সপ্তাহ পরে

অজিতের পত্রে জানলুম রায়মশাই আমার খোঁজে এসে পুরীর ঠিকানা জেনে নিয়ে গেছেন। সুধীরার পত্রের আজও জবাব দেওয়া হয়নি। সকল সময় সেই জন্যই যেন মনটা কেমন অস্থির হ'য়ে ওঠে।

সুধীরার পত্রখানা সঙ্গেই এনেছিলুম। সেখানা বার করে বার বার পড়ি আর ভাবি তাইত, তার কি অপরাধ। নানা চিন্তায় মনটা ব্যাকুল হইয়া ওঠে রাত্রে আর ভাল ঘুম হয় না। পরেরদিন কোথাও বেড়াতে যেতে ভাল লাগলো না। চুপকরে শুয়ে আছি চাকরটা একখানা পত্র দিয়ে গেল পত্র দেখেই বুঝলুম অজিত লিখেছে, কিন্তু কাল ত' তার পত্র পেয়েছি আবার আজ, নানা দুর্ভাবনার মাঝখানে পত্রখানা পড়তেই, 'সুধীরার আজ কয়দিন খুব অসুখ' এই সংবাদ মনটাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুললে। বিছানা ছেড়ে উঠে পাইচারি করতে করতে ঠাকুরকে খবর পাঠালুম আজ আর খাবার ইচ্ছে নেই শরীরটা তত ভাল নয়।

কলকাতায় ফিরব' কিনা ভাবছি এমন সময় টেলিগ্রাফ পিয়ন এসে হাজির। তাড়তাড়ি খামখানা ছিড়ে দেখি রায়মশাই তার করেছেন, "সুধীরা অত্যন্ত পীড়িত, তোমাকে দেখার জন্য অত্যন্ত অস্থির, ও সঙ্গে সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ।

সেইদিনই হোটেলের দেনা শোধ করে জগন্নাথ দেবের কাছে সুধীরার আরগ্যের জন্য মানত করে কলকাতায় রওনা হলুম ষ্টেশন থেকে সটাং রায়মশাইয়ের বাড়ী এসে দেখি সকলেই

ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে রায়মশাই বললেন, "সুবোধ এসেছ, বড় বিপদ কি হবে জানি না" এবং কাপড় দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন।

রাইমশাইকে বল্লুম, "ভয় কি, উতলা হবেন না সেরে যাবে।" সুধীরার পিসিমা রোগীর মাথায় বরফ দিতে ব্যস্ত ছিলেন। পিসিমাকে বললুম, "ব্যাগটা আমায় দিয়ে আপনি আর খানিকটা বরফ ভেঙ্গে নিয়ে আসুন।"

সুধীরার মাথায় বরফ দিতে বসে গেলুম। জ্বরের ধমকে ও বিকারের ঘোরে সুধীরা মাঝে মাঝে "সুবোধদা এসেছে" এই প্রলাপ বকছিল। ঠাকুমা রোগীর পাশেই বসেছিলেন। তিনি রোগীর গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে বললেন, "হ্যা মা, চেয়ে দেখ তোমার সুবোধদা এসেছে।"

জানি না ঠাকুমার কথাগুলি সুধীরার কানে গিয়েছিল কিনা কিন্তু হঠাৎ সুধীরা আমার দিকে একবার চেয়ে দেখলে। মনে হল সে চাহনিতে যেন কতদিনের সঞ্চিত ব্যথা জমাট হয়ে আছে।

প্রাণহীন পুতুলের মত নির্ব্বাক হয়ে রইলুম যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সকল শক্তি লোপ পেয়ে গেল। ডাক্তার রোগী দেখে চলে যাবার পর সকলকেই দেখলুম যেন বেশ একটু চিন্তিত ও বিমর্ষ। নিতান্ত জোর করে নিজের প্রকৃত অবস্থাকে চেপে রেখে

বললুম, "বিচলিত হবার কিছুই নেই রায়মশাই, আমার মনে হয় দুচার দিনের মধ্যেই সুধীরা ভাল হয়ে উঠবে।

রায়মশাই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি বড় দুর্ভাগা সুবোধ, "তোমরা তাই বল,মা যেন আমার তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।"

সুধীরার কানের কাছে মুখ রেখে আস্তে আস্তে বললুম, "সুধীরা, এই যে আমি এসেছি।

ঠাকুমা সুধীরার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "ঠাকুর আমার মাকে আর কষ্ট দিও না সারিয়ে দাও।"

বেশ ভাল করে সুধীরার দিকে আর একবার চেয়ে দেখলুম মনে হল যেন তার সোনার মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ম্লান কালো হরিণ চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। খুব চেষ্টা করেও দীর্ঘ নিঃশ্বাসকে চেপে রাখতে পারলুম না কারণ স্পষ্টই বুঝলুম সুধীরা তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে। তিন দিন অক্লান্ত সেবা সুধীরাকে ধরে রাখতে পারলে না। জানিনা সে তার যাত্রা পথের সকল পাথেয় চুকিয়ে দিয়ে আমার ওপর কতবড় একটা অভিমানের বোঝা চাপিয়ে রেখে গেল।

বাড়ী ফিরেছি। কিছুই আর ভাল লাগে না। চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি পরের দিন অজিতকে ডেকে পাঠালুম। কিন্তু সে এলো না, খবর এলো সে বীণাকে বিয়ে করেছে। এখন শ্বশুরবাড়ী।

—শেষ—